ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪২, সংখ্যা ১ সম্পাদক : পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩৯৯, বৈশাখ

সূচী

পৃষ্ঠা

নববর্ষের প্রারম্ভে (সম্পাদকীয়)

অসিতাভ দাস

নিজে

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

কিছু আপন কথা (১ম পর্ব)

ইয়াসলিক

এবং

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে একটি বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে।

বিশিষ্ট গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানী অধ্যাপক পি. এন. কাউল আগামী ১২ই আগষ্ট, ১৯৯২ (বুধবার) অপরাহ্ণ ৬টায় রাজ্যযুবকেন্দ্রের (মৌলালী) প্রেক্ষাগৃহে ঐ বক্তৃতা দেবেন। ঐ বক্তৃতাসভায় সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়

যতীন্দ্রনাথ সত্তপথী
সাধারণ সম্পাদক,
ইয়াসলিক

রামকৃষ্ণ সাহা
সাধারণ সম্পাদক,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪২, সংখ্যা ১ | সম্পাদক : পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায় | ১৩৯৯, বৈশাখ

সম্পাদকীয়

॥ নববর্ষের প্রারম্ভে ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রকাশিত গ্রন্থাগার পত্রিকাটি ১৩৯৯ সালের বৈশাখ মাসে ৪৩ বৎসরে পদার্পণ করলো। শুভ নববর্ষে পরিষদ সমস্ত সদস্যদের, পাঠক, পাঠিকাদের শুভেচ্ছা কামনার সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

পরিষদের সদস্যরা লক্ষ্য করেছেন যে তাঁদের পত্রিকাটি বিরল দৃষ্টান্ত হিসাবে দীর্ঘ ৪২ বৎসর যাবৎ নানাভাবে তথা পরিবেশনের মাধ্যমে সদস্যদের সেবা করে এসেছে। কখনো নিয়মিত বা কখনো অন্য পদ্ধতিতে। সদস্যদের গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্য পৃথক কোন মূল্য দিতে হয় না। ফলে গ্রন্থাগার পত্রিকাটি প্রকাশনার ব্যয়ভার পরিষদের তহবিল থেকে মেটাতে হয়।

এক সময়ে পত্রিকাটি ছিল ত্রৈমাসিক। বহু বৎসর হলো পরিষদের কর্মকর্তারা নানা অসুবিধার মধ্য দিয়েও এটাকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করেছিলেন নানা আশা নিয়ে। তাঁরা মনে করেছিলেন গ্রন্থাগারিকতাকে বৃত্তি হিসাবে বিকশিত করতে গেলে প্রয়োজন হয় সুদৃঢ় সংগঠনের, ঐ বিষয়ের বই, পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা, সভা-সমিতি আলোচনাচক্র, বক্তৃতা ইত্যাদির। এর ফলে বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ঐ বিষয়ের তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারেন এবং নিজেদের কর্মধারার মান উন্নয়ন করতে পারেন।

১৯২৫ সাল থেকে, পরিষদ যে যাত্রা শুরু করেছে, আজ বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হয়েও তা গ্রন্থাগার আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে পরিগণিত। রঙ্গনাথনের জন্মশতবর্ষে পরিষদের কাছে সমাজের যে আকাঙ্খা; কর্মীদের প্রত্যাশা পরিষদ পূরণ করতে পারছে কিনা তার মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। বার্ষিক সাধারণ সভা অবশ্যই একটা স্থান যাতে সাধারণ সদস্যরা নানা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পরিষদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা করার সুযোগ পান। কিন্তু ২ হাজার সদস্যের মধ্যে সাধারণ সভায় উপস্থিতিকে যদি সূচক হিসাবে গ্রহণ করা যায় তাহলে বিষয়টা উৎসাহোদ্দীপক যে নয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সংগঠনকে সতেজ রাখতে গেলে সদস্যদের পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন নচেৎ ঐ সংগঠন কাণ্ডজে সংগঠনে পরিণত হয় যা পরবর্তীকালে সমগ্র বৃত্তির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়—এ বক্তব্যে সবাই একমত হলেও বাস্তব প্রয়োগে অনীহার কারণ অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন।

ষাটের দশকে গণ আন্দোলনের জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন সঞ্জীবিত হয়। যাঁরা আন্দোলন পরিচালনা করতেন তাঁরা আধিকভাবে লাভবান হবেন এরকম মানসিকতা নিয়ে পরিষদে অংশগ্রহণ করতেন না; এমনকি যাঁরা এখন নেতৃত্বে আছেন তাঁরাও কোন রকম ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের কথা মনে রেখে পরিষদে আসেন না ফলে পরিষদের সুনাম আজও অক্ষত আছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে আজকাল যাঁরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পঠন-পাঠনে যুক্ত শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীরা, বৃত্তিমূলক সংগঠনের সঙ্গে তাঁদের সংশ্রব কমে আসছে।

যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পাশ করে বিভিন্ন সংগঠনে কাজ করছেন বা চাকুরীর অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা পরিষদের কর্মকাণ্ডে কতটা উৎসুক? পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ বক্তৃতা, বা ইয়ারলিকের ষ্টাডি সার্কলে অংশ গ্রহণ-কারী ব্যক্তিদের মধ্যে নতুন মুখ কত দেখা যায়?

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটছে তা জানার আগ্রহ বেশি দেখি না। প্রশ্ন শুঠে যাঁরা পড়তে আসেন তাঁরা জীবিকার প্রয়োজনে এলেও কি এটা অনুধাবন করেন না যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিকশিত না হলে তাঁদের ভবিষ্যত আলোকোজ্জ্বল হতে পারে না। এজন্য সুদৃঢ় গ্রন্থাগার আন্দোলন বিশেষ প্রয়োজন। বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে শিক্ষা ব্যবস্থা সহ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে প্রথম বলি হচ্ছে তা তো তাঁদের অজানা নয়। তবুও সমাজে পরিষদ যে সম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনা করছে তাকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব কি শুধু নেতৃবৃন্দের? আমাদের সবাইয়ের কি সাগ্রহ অংশগ্রহণের প্রয়োজন নেই?

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাসিক পত্রিকার সংখ্যা বেশি নয়, এমন কি বিদেশেও এর নজির বেশি নেই। যাঁরা মাসিক পত্রিকা চালান তাঁরা জানেন কাজটি কি অসাধারণ পরিশ্রম-সাধ্য এবং ব্যয় সাপেক্ষ। DRTC, INSDOC প্রভৃতি সংস্থার পিছনে সরকারী অর্থ থাকলেও তাঁরা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন না। বর্তমানে গ্রন্থাগার পত্রিকার সামনে সব চাইতে বড় অন্তরায় হলো অর্থ। বছরে কম করে ৪০/৪৫ হাজার টাকার মত ব্যয় হচ্ছে পত্রিকাটির পিছনে। চার কর্মার পত্রিকাটি তিন কর্মায় দাঁড় করানো হয়েছে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে। কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ও ডাক খরচ সব মিলিয়ে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পরিষদের চাঁদা বাবদ ও আজীবন সদস্যদের চাঁদার সুদ বাবদ যা আয় তাতে পত্রিকাটি পূর্ণমর্যাদায় প্রকাশ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিগত ৪/৫ বছর সরকারী অনুদান বাড়েনি এক পয়সা; বরং বিল্ডিং য়েনটেন্যান্স গ্র্যান্ট দেওয়া হচ্ছে না বিগত ৩ বৎসর হলো। সদস্যদের চাঁদার হারের সঙ্গে মাথা পিছু ব্যয়ের কোন সামঞ্জস্য নেই। এমনকি সমাজের দুর্বলতর অংশের কথা বিবেচনা করে কোর্স ফি এত কম রাখা হয়েছে তা দিয়ে বাৎসরিক প্রশাসনিক খরচ চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

গ্রন্থাগার পত্রিকার আরেক বাধা হলো ভাল লেখার অভাব। রাজ্যের সাত সাতটা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪০/৫০ জনের মত শিক্ষক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কাজে যুক্ত রয়েছেন। তাঁরা ছাত্রদের গ্রন্থাগার আন্দোলনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করছেন তা অজানা। তাঁরা কি গবেষণা করছেন সেটাও গবেষণার বিষয়। তাঁদের গবেষণা লব্ধ ফল মাতৃভাষায় প্রকাশের প্রচেষ্টা যে কতদূর তার পরিচয় পত্রিকার বিগত সংখ্যাগুলির সূচীপত্রের নজর দিলেই পরিষ্কার হবে। প্রশ্ন জাগে পরিষদের তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আজ কেন এই হীনদশা? গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতাগুলি যদি শিক্ষকমহাশয়রা প্রবন্ধের আকারে মাতৃভাষায় প্রকাশ করেন তবে সামগ্রিক-ভাবে বৃত্তিকুশলীরা উপকৃত হন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের আরেকটি দিক হলো কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার প্রশ্নগুলি। এক্ষেত্রে এরাজ্যের পৃথক পৃথক কয়েকটি সংগঠনের উদ্ভব হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগার, সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী প্রভৃতি সংস্থায় একাধিক সংগঠন রয়েছে; সাধারণ গ্রন্থাগার, কলেজ গ্রন্থাগার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও কর্মী সংগঠন হয়েছে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তুলনীয় সংগঠন আর নেই। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে পরিষদের কোন বিকল্প নেই। আর এই সংস্থা হলো সামগ্রিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল স্রোত। কিন্তু পরিষদের প্রধান দুর্বলতা হলো আর্থিক সমস্যা এবং স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর অভাব। আগের তুলনায় স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে, ফলে পরিষদের কর্মধারার আশানুরূপ ব্যাপ্তি ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে প্রত্যেক সদস্যের অংশগ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন।

সবশেষে উল্লেখ করি যে এ বৎসর অধ্যাপক রঙ্গনাথনের জন্ম শতবার্ষিকী। তিনি আজীবন গ্রন্থাগার বৃত্তিকে সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছেন—আসুন আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুসংহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সচেষ্ট হই।

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

(২য় পর্ব)

অসিতাভ দাশ
যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল

প্রথম পর্বে আমরা দেখলাম যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার অনাদরে অবহেলায় গড়ে উঠল অনেকটা রূপকথায় বর্ণিত রাজার দুয়োরাণীর সন্তানের মত। তার সঠিক মোচন কবে হবে কেউ জানেনা ?

এবার আমরা দেখব বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কি কি উপাদান থাকা দরকার ও আমাদের দেশে তা কতখানি কার্যকর করা হয়েছে ? বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে মূল উপাদান চারটি (১) গ্রন্থ গৃহ বা কক্ষ (২) গ্রন্থ সংগ্রহ বা গ্রন্থ সম্ভার (৩) গ্রন্থ পরিচালক বা কর্মীবৃন্দ (৪) ব্যবহারকারী বা পাঠক।

যদিও কেউ কেউ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংগ্রহকে প্রথম বা মূল উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন, কিন্তু আমার মতে গ্রন্থ গৃহ বা কক্ষ হওয়া দরকার প্রথম বা মূল উপাদান। আমাদের দেশে গ্রন্থ গৃহ বা কক্ষ সবচেয়ে বেশী অবহেলিত ও কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

১৯৩৮ সালে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় তাঁর ভাষণে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বলেছিলেন "আমাদের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারকে যে মর্যাদা দেওয়া উচিত তা যেন না। অনেক সময় সর্বাধিক সাঁতসেতে এবং অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে গ্রন্থাগারের জায়গা দেওয়া হয়.....গ্রন্থাগারের পরিবেশ থাকে অনাকর্ষণীয়।"

পঞ্চাশ বছর বাদেও তৎকালীন অবস্থার কোন বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। যদিও ওয়েষ্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অব্ হায়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের জন্য নিম্নিষ্ট পরিমাপ ঠিক করে দিয়েছে, কিন্তু সেই শর্ত আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে মান্য করা হয় না।

জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় বি. এস. কেশবন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন "A School library is the most strategic point in an institution and it compensates for poor or bad teaching"। শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নেই, এবং অনস্বীকার্য।

শুধু গ্রন্থাগার থাকলে চলবে না, চাই ব্যবহারকারীদের পাঠোপযোগী প্রশস্ত ভাবনা। কেননা একটি পর্যাপ্ত গ্রন্থ-সংগ্রহ অপর্যাপ্ত স্থানের জন্য অকার্যকরী হয়ে পড়ে। ছাত্রদের মধ্যে পুস্তক পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি করা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সেজন্য গ্রন্থাগার গৃহটিকে আকর্ষণীয় ও পাঠোপযোগী করে তুলতে হবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গৃহের আয়তন সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের মান প্রচলিত আছে। আয়তন নির্ধারণ করার পূর্বেই স্থির করে নিতে হবে, গ্রন্থাগারের কটি কক্ষ থাকবে ও তার আয়তন কত হবে ? এর সাথে স্থানের সঠিক পরিমাপ নির্ধারণ করতে হলে প্রথমে স্থির করতে হবে যে গ্রন্থাগারে কি কি জিনিস থাকবে ? অর্থাৎ শেলফ্, টেবিল, চেয়ার, ক্যাটালগ ক্যাবিনেট ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত করে, এই সাজ-সরঞ্জাম গৃহের কতখানি স্থান দখল করবে তার আয়তন নির্ধারণ করা দরকার।

সবচেয়ে ভাল হয় গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী এবং পুস্তক মঞ্চের জন্য পৃথক কক্ষ ও পাঠগৃহের জন্য যদি অন্য একটি কক্ষের ব্যবস্থা করা যায়। অবশ্য প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলি পৃথক অথবা একই কক্ষের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বিদেশে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গৃহ সম্বন্ধে কি ধরণের ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে তা দেখা যাক্। American Library Association, Committee on Post-War Planning, School Libraries for Today and Tommorw সুপারিশ করে যে, কম সংখ্যক ছাত্র সম্বলিত বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের ঘর ও স্ট্যাক (Stack) কম একটি ঘরে হলেই চলবে, আলোচনা গৃহ না থাকলেও চলবে, কিন্তু পাঠকক্ষ আবশ্যিক ভাবে থাকতে হবে।

কিন্তু বেশী ছাত্র সমন্বিত বিদ্যালয়ে থাকবে একটির বেশী পাঠকক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য আলোচনা কক্ষ,

গ্রন্থাগারের কাজের জন্য একটি কক্ষ, ষ্ট্যাক ঘর, অতিথি-তিথ্যাগার কক্ষ এবং গ্রন্থাগারিকের জন্য পৃথক কক্ষ।

পাঠকক্ষের জন্য নিম্নলিখিত মান গ্রহণ করা হয়েছে :

ছাত্রসংখ্যা	ন্যূনতম আসন সংখ্যা	পাঠকক্ষের সংখ্যা
২০০	বৃহত্তম শ্রেণী + ২০ জন	১
৫০০	৭৫	১
১০০০	১০০	১
২০০০	২০০	২
৩০০০	৩০০	৩
৫০০০	৫০০	৫

গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজকর্মের জন্য এবং গ্রন্থাগারিকের ব্যবহারের জন্য যথাক্রমে ২০০।২৩ বঃ ফুঃ এবং ১১০ বঃ ফুঃ স্থানের প্রয়োজন। পাঠকক্ষের মোট আয়তন নির্ধারণ করতে হলে উভয় ক্ষেত্রেই আসন সংখ্যাকে ২৫ বঃ ফুঃ দিয়ে গুণ করতে হবে। যদিও বলা আছে, আসল সংখ্যাকে ৩০ বঃ ফুঃ দিয়ে গুণ করাই সঙ্গত,কেননা গ্রন্থাগারের আসববাবপত্র অনেকখানি জায়গা অধিকার করে নেয়।

আবার, শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে যে দেশকে আমরা চিহ্নিত করে থাকি, সেই দেশে অর্থাৎ গ্রেট বৃটেনে শিক্ষা বিভাগ ১৬০ জন সমন্বিত 1-form মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অন্যূন ৬০০ বর্গফুট স্থান বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট করেছে। এইভাবে 2-form বিদ্যালয়ের জন্য ৯৬০ বর্গফুটে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে 6-form (Grammar School) বিদ্যালয়ের জন্য ১২০০ থেকে ১৫০০ বর্গ ফুটের কথা উল্লেখ করা আছে।

যদিও Carnegie Report-এ একই সাথে যাতে অধিক সংখ্যক ছাত্র গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। এই সংখ্যাকে ৩৫ বঃ ফুঃ বা ৪০ বঃ ফুঃ দিয়ে গুণ করলে গ্রন্থাগার গৃহের মোট আয়তন পাওয়া যাবে। অবশ্য এই আয়তনের মধ্যে পুস্তক মঞ্চ, পাঠকক্ষ সব কিছুরই স্থান সঙ্কুলান হবে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের 1-form বিদ্যালয়ের জন্য অন্যূন মোট ১,০৫০ বর্গফুট স্থান, 2-form বিদ্যালয়ের জন্য অন্যূন ১২০০ বর্গফুট এবং 3-form বিদ্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত ৬০০ বর্গফুট স্থান প্রয়োজন।

গ্রেট বৃটেনের School Library Association প্রকাশিত রিপোর্টে Carnegie Report-এর প্রস্তুত মানই গ্রহণ করা হয়েছে।

এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই Carnegie Report-এর তুলনায় গ্রেট বৃটেনের শিক্ষা বিভাগের মান অনেক অধিকতর। কিন্তু ঐ দেশের শিক্ষা বিভাগ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে গ্রন্থাগারকে বিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে ওখানে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। যা আমাদের দেশে এখনও অসম্ভব।

এবার বিদেশ থেকে স্বদেশের দিকে তাকানো যাক্। আমাদের দেশেও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গৃহ নিয়ে কিছু আলোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে। প্রয়োগ কতখানি হয়েছে সেটা পরে আলোচনায় আসছি।

১। ভারত সরকার দ্বারা নিয়োজিত National Buildings Organisation ১৯৫৯-৬০ সালে এক সমীক্ষার দ্বারা জানায় যে (Report on Secondary School Buildings) প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৃথক গ্রন্থাগার গৃহ বা কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সংস্থার মতে অন্যূন ৬০০ বর্গফুট আয়তনের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে কিন্তু গ্রন্থাগারের স্থান চাহিদা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। সংস্থার রিপোর্টে এও বলা হয়েছে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র কিন্তু অতিরিক্ত বিস্তৃত বা প্রশস্ত গ্রন্থাগার গৃহ ব্যবহার, কাজের ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় ও কাম্য নয়।

২। Council of Higher Secondary Education India সুপারিশ করেছে যে, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তার পাঠকক্ষের জন্য অবশ্যই ৫০০ বর্গফুট অথবা মোট ছাত্র সংখ্যার ২৫ ভাগ × ১০ বর্গফুট এর মধ্যে যেটি বড়।

অন্তভাবে বলা যায়, যে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ৫০০ জন আছে, তাতে গ্রন্থাগার গৃহের আয়তন অবশ্যই ১২৫০ বর্গফুট হবে এবং যদি বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ৭৫০ জন হয়, তবে গ্রন্থাগার গৃহের আয়তন হওয়া উচিত ১৮৭৫ বর্গফুট।

৩। Ministry of Works Housing Supply, Govt of India বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যে নক্সা অনুমোদন করেছে তাতে বলা আছে একটা শ্রেণীতে ৪২ জন ছাত্র থাকবে ও তাদের জন্য গ্রন্থাগারে বসার ব্যবস্থা থাকবে এবং গ্রন্থাগারে ৬,০০০ বই রাখার মত তাকের (self) ব্যবস্থা থাকবে। পাঠকক্ষের পাশে একটা ছোট ঘরের ব্যবস্থা থাকবে যেখানে আলোচনাচক্র বা Group Discussion-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি না অন্য কোন ঘরের ব্যবস্থা করা যায়, সার্কুলার কাউন্টারের জন্য নয় বর্গ মিটারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বেশী ছাত্রসংখ্যা সমন্বিত বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের জন্য দুইটি কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এটাও উল্লেখ করা আছে, গ্রন্থাগার গৃহের নক্সার মধ্যে ঘরের আয়তন ও অন্যান্য পরিকল্পনা ছাত্রসংখ্যা, বইয়ের সংখ্যা ও অন্যান্য পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করা যেতে পারে।

৪। Town Planning Organisation, Ministry of Health, Govt. of India সুপারিশ করেছে ৩৬০ জন সমন্বিত বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ কক্ষের আয়তন হওয়া দরকার ১২৮০ বঃ ফুঃ। পৃথক পুস্তক ভাণ্ডার ২০০ বঃ ফুঃ। যদি শতকরা দশজন বড় ছাত্রের জন্য পাঠকক্ষে আসনের বন্দোবস্ত করা হয় তবে ছাত্র প্রতি স্থান থাকা দরকার ২০ বঃ ফুঃ।

৫। অন্ধ্রের Director of Public Instructions সুপারিশ করেছেন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গৃহের মোট আয়তন হবে ৬২৫ বঃ ফুঃ।

৬। প্রধান শিক্ষকদের সম্মেলনে সুপারিশ করা হয়, গ্রন্থাগার গৃহে মোট ৪০টি আসন থাকবে। আসন প্রতি ১৬ বঃ ফুট জায়গার ব্যবস্থা থাকবে অর্থাৎ মোট ৬৪০ বঃ ফুট গ্রন্থাগারের আয়তন হবে।

৭। West Bengal Council of Higher Secondary Education উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে গ্রন্থাগারের জন্য ৫০০ বঃ ফুট সুপারিশ করেছে ও একটি পাঠকক্ষের কথা বলা হয়েছে যা গ্রন্থাগারের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

৮। Indian Standards Institution (ISI) বা ভারতীয় মানক সংস্থা (বর্তমানে যার নাম Bureau of Indian Standards) ১৯৬০ সালে গ্রন্থাগার গৃহের মান নির্ধারণ করে (IS 1553 : 1960)। ISI একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য যে মান সুপারিশ করেছে তা নিম্নরূপ :

	মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার	প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার
পুস্তকের সংখ্যা	৪,০০০ থেকে ৩০,০০০	৫০০ থেকে ৩,০০০
প্রদর্শিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা	২০ থেকে ৫০	১০ থেকে ২০
পাঠকের আসন সংখ্যা	৪০ থেকে ১২০	৪০ থেকে ৮০
গ্রন্থাগার কর্মী	২ থেকে ৪	১ থেকে ৩

এর জন্য প্রয়োজন হবে, ক-পুস্তক ভাণ্ডার। খ-সাধারণ পাঠকক্ষ। গ-পত্র-পত্রিকা পাঠকক্ষ। ঘ-পুস্তক সূচীকরণ কক্ষ। ঙ-গ্রন্থাগারিকের কক্ষ।

বিভিন্ন কক্ষের আয়তন সম্বন্ধে এই মানে যে তথ্য প্রদত্ত তা নিম্নরূপ : গ্রন্থাগারের মোট আয়তন (কেবলমাত্র অবশ্য প্রয়োজনীয় কক্ষগুলি) গ্রন্থ ভাণ্ডার ৪৭২৫ বঃ মিঃ, পাঠকক্ষ ৫২৫০ বঃ মিঃ, গ্রন্থাগারিকের ৩০ বঃ মিঃ এবং অন্য দুজন কর্মীর জন্য ৯ বঃ মিঃ হিসেবে ১৮ বঃ মিঃ (প্রায় ১৫৯০ বঃ ফুট)। অর্থাৎ

(ক) সমগ্র গ্রন্থাগার গৃহের আয়তন হিসেবে আসন সংখ্যা প্রতি প্রায় ৪০ বঃ ফুট। এই মান Carnegie Report-এর সুপারিশের অনুরূপ।

(খ) কেবল পাঠকক্ষের আয়তন হিসেবে আসন সংখ্যা প্রতি প্রায় ১৫ বঃ ফুট।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৭ সালে জাতীয় স্তরে মানক সৃষ্টি করা ; মানকের প্রচলন ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ISI-এর জন্ম হয়। ভারতীয় মানক সংস্থা গ্রন্থাগার গৃহের মান নির্ধারণের জন্য যে কমিটি গঠন করেছিলেন জাতীয় অধ্যাপক এস. আর. রঙ্গনাথন ছিলেন সেই কমিটির সভাপতি।

৯। ভারতীয় মানক সংস্থা পরবর্ত্তী পর্যায়ে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গৃহের জন্য (IS : 8338—1976—School Library Buildings) পৃথকভাবে মান নির্ধারণ করে। (মানে প্রদত্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারটির নক্‌শা শেষ পৃষ্ঠায় দেওয়া হল)

এই মানে বলা হয়েছে যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এমন স্থানে হওয়া উচিত যাতে বিদ্যালয়ের প্রবেশ পথ থেকে সরাসরি সংযোগ থাকে ও ক্লাসঘরগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় ভাবে অবস্থান করে।

বিদ্যালয়ের যে অংশে গ্রন্থাগারটি অবস্থিত হবে সেই স্থানটি পাঠকদের পক্ষে নির্জন ও শান্ত হওয়া দরকার।

ঘর (Rooms) :

(১) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য কটি ঘর দরকার তা নির্ভর করবে কি ধরণের বিদ্যালয় ও তার ছাত্রসংখ্যার উপর।

(২) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রবেশ পথ একটি বারান্দা বা লবির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া দরকার।

(৩) ছেঁড়া বই বাঁধাই করার জন্য একটি ছোট ঘর গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা দরকার।

স্থান আবশ্যক (Space requirements) :

পাঠকক্ষে ছাত্রদের আসন সংখ্যা, বইয়ের সংখ্যা, কর্মীসংখ্যা পূর্বে বর্ণিত (IS : 1553 : 1960)-এর অনুরূপ সুপারিশ করা হয়েছে।

(১) পাঠকক্ষে প্রতি ছাত্র পিছু বসার স্থান নিরূপণ :

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়—১ বঃ মিঃ ন্যূনতম অর্থাৎ প্রায় ১১ বঃ ফুঃ।

(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়—১·৫ বঃ মিঃ ন্যূনতম অর্থাৎ প্রায় ১৬·৫ বঃ ফুঃ।

(২) যদি ষ্ট্যাক রুম ও পাঠকক্ষ একই জায়গায় হয় তাহলে বইয়ের তাক রাখার জন্য নিম্নলিখিত স্থান দরকার :

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি মিটারে ৩০ থেকে ৩৫ টি বই রাখা যায় এমন তাকের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতি মিটারে ২৫ থেকে ৩০টি বই রাখা যায় এমন তাকের ব্যবস্থা করতে হবে।

অডিও-ভিস্যুয়াল প্রৌরেক্ষ ঘরের জন্য ৪৫ বঃ মিঃ এবং ওয়ার্কশপ ঘরের জন্যও ৪৫ বঃ মিঃ আবশ্যক। আলোচনা কক্ষে প্রতি ছাত্র পিছু ২ বঃ মিঃ স্থান থাকা আবশ্যক।

গ্রন্থাগার ক্লাশরুমের জন্য মোট ৭৫ বঃ মিঃ আবশ্যক। আবার এও বলা হয়েছে প্রধান গ্রন্থাগার কক্ষ প্রয়োজনবোধে ষ্ট্যাক রুম ও রেফারেন্স ঘর হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য সেখানে বাহির পথে বই লেনদেনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রদর্শিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা পূর্বের মান (IS 1553 : 1960) থেকে হ্রাস করে বলা হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১০ থেকে ২০, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২০ থেকে ৩০।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন তাঁর এক প্রবন্ধে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পাঠকক্ষ প্রসঙ্গে লিখেছেন, পাঠকক্ষে কমপক্ষে ১২০টি আসন থাকবে যাতে করে অন্ততঃ এক সঙ্গে তিনটি শ্রেণীর ছাত্রদের বসার ব্যবস্থা করা যায়। যখনই কোন শিক্ষক অনুপস্থিত হবেন তখনই সেই শ্রেণীর ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটা জিনিস আমরা

উপলব্ধি করছি যে, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গৃহ ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা, পর্যালোচনা, মান নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত চিত্র কি ?

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব সরকারী বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ট্রাষ্ট বা মিশনারী দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় এবং কিছু সরকারী অনুমোদিত বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার গৃহ বা কক্ষের অবস্থা আশানুরূপ। কিন্তু সরকারী পোষিত ও সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির পর্যাপ্ত পরিমাণ স্থান আছে, আর বাকী নব্বই ভাগের অবস্থা খুবই হতাশাজনক।

কিন্তু বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গৃহ যে ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় কতখানি, তা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। আমি যে বিদ্যালয়ে কর্মরত, সেই বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কক্ষটি ছাত্রদের কাছে মোটামুটি আকর্ষণীয়। গ্রন্থাগার কক্ষটি প্রশস্ত, সুসজ্জিত ও পর্যাপ্ত আলোয় ব্যবস্থা আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের দ্বিবা বিভাগের ছাত্ররা অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে। এক সাথে প্রায় ৪০ থেকে ৪৪ জনের রিডিং টেবিল সহ বসার ব্যবস্থা আছে।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্ররা যখন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে গ্রন্থাগার কক্ষে প্রবেশ করে, তখন তাদের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় তাদের চোখে যেন লেগে আছে অপার বিস্ময় ও নূতন অজানা রাজ্যে প্রবেশের স্বাধীনতার অদ্ভুত আনন্দ।

তাদের দেখলে আমারও মনে হয় বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর নায়ক অপুর মত তাদের নবীন চোখে বইয়ের আলমারীর দিকে তাকিয়ে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় অচেনার আনন্দ তারা উপভোগ করছে যেন।

রাস্তাঘাটে, বাসে ট্রামে, হোটেল রেস্তোঁরায় কান পাতলেই শোনা যায় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাগত মান, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণের পদ্ধতি, বিদেশী ভাষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত কিনা, ল্যাবরেটরী ব্যবহারের সুযোগ কতখানি, খেলার মাঠ আছে কিনা, বিদ্যালয়ে কম্‌পিউটার এসেছে কিনা ইত্যাদি আলোচনাসমূহ।

বলা বাহুল্য, এই আলোচনা শুধু অভিভাবক—অভিভাবিকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, জনসাধারণও এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। শুধু কখনও শোনা যায় না, বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও তার সুযোগ-সুবিধা এবং সমস্যা-প্রতিকার নিয়ে কোন ব্যক্তি অপরের সাথে আলোচনা করছেন।

বিখ্যাত দার্শনিক শোপেন হাওয়ার সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলন আছে। শোপেন হাওয়ার হোটেলে গিয়ে প্রত্যহ একটি স্বর্ণমুদ্রা টেবিলের ওপর রেখে খেতে বসতেন। ওয়েটার ভাবত ভালো করে খাওয়ালে বুঝি ঐ মুদ্রাটি পুরস্কার পাবে। কিন্তু তিনি রোজই ওটা পকেটে করে নিয়ে চলে যেতেন। ওয়েটারটি কৌতূহল দমন করতে না পেরে তাঁকে একদিন প্রশ্ন করল, তিনি কেন রোজ স্বর্ণ মুদ্রার লোভ দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে নেন ? দার্শনিক জবাব দিলেন, আমার চারপাশের টেবিলে যে সব লোক খেতে বসে, তারা যেদিন কুকুর, ঘোড়া ও মহিলাদের বিষয়ে কোন কথা না বলে গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে শুনতে পাব সেদিন এই মোহরটি ভিখারীদের দিয়ে দেব।"

আমারও শোপেন হাওয়ারের অনুকরণে বলতে ইচ্ছে করে আমিও একটা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বসে আছি, যেদিন শুনতে পাব জনসাধারণ বিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রসঙ্গের সাথে সাথে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করছে, সেদিন আমি স্বর্ণমুদ্রাটি কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করে দেব।

মনে হয় আমার এই জীবনে সেই সাধ বোধহয় আর পূর্ণ হবে না ? (ক্রমশঃ)

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নক্‌শা

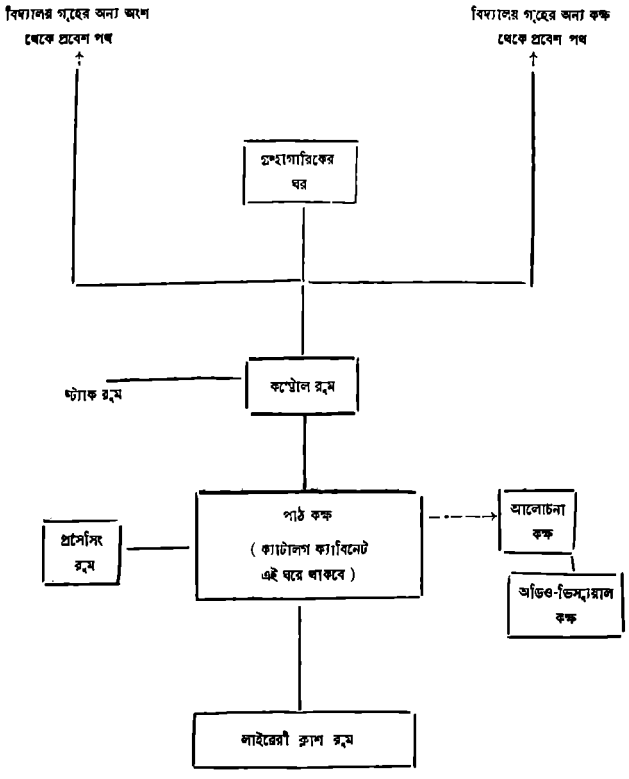

১৯৯২ এবং ১৯৯৩ সালের জন্য নির্বাচিত ইয়াসলিকের সংসদ সভা

কর্মসমিতির সদস্যবৃন্দ

সভাপতি :

ডঃ উদ্ধারঞ্জন ঘটক

অধিকর্তা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ্ সায়েন্স, কলিকাতা

সহ-সভাপতিবৃন্দ :

ডঃ সেওয়া সিং, অমৃতসর	ডঃ এস. এম. গাঙ্গুলী, কলিকাতা
ডঃ এস. সীতারামা, বাঙ্গালোর	শ্রী আহমেদ সুলতান, হায়দ্রাবাদ
ডঃ এ এ. এন. রাজু, হায়দ্রাবাদ	শ্রীমতী হীরা কাপাসি, নতুন দিল্লী

সাধারণ সম্পাদক :

শ্রী জে. এন. সতপথি, কলিকাতা

যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয় :	সহ-সম্পাদকদ্বয় :
শ্রী জগমোহন দাস, কলিকাতা	শ্রী মধুসূদন চন্দ্র, কলিকাতা
শ্রী সুবীর কুমার সেন, কলিকাতা	শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার, কলিকাতা

গ্রন্থাগারিক :

শ্রী কে. পি. মুখার্জী, কলিকাতা

কোষাধ্যক্ষ :

শ্রী পি. জানা, কলিকাতা

সদস্যবৃন্দ :

শ্রী জি. সি. বসাক, কলিকাতা	শ্রী আর পি. কুমার, নতুন দিল্লী
শ্রী অমিতাভ চ্যাটার্জী, কলিকাতা	শ্রী নির্মলেন্দু মুখার্জী কলিকাতা
শ্রীমতী এস. এল. চিল্লা, নতুন দিল্লী	শ্রী ডি. কে. নাগ, কলিকাতা
শ্রী এইচ্. কে. দত্ত, কলিকাতা	শ্রী এম. এন. নাগরাজ, কলিকাতা
শ্রী এস. বি, ঘোষ, নতুন দিল্লী	শ্রী রোসন্ রায়না লক্ষ্ণৌ
ডঃ এম. এ. গোপীনাথ, বাঙ্গালোর	শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী, কলিকাতা
শ্রী পবন কুমার গুপ্ত, জয়পুর	শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, কলিকাতা
শ্রী এন. ভি. জগরাও, হায়দ্রাবাদ	শ্রী বি. কে. সেন, নতুন দিল্লী
শ্রী এস. কে. কাপুর কলিকাতা	ডঃ এ. কে. সিন্‌হা, জামসেদপুর
শ্রী এস্. এম. কুলকার্নী, কলিকাতা	ডঃ পি সোমারাজু, ওয়ালটেয়ার

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : কিছু আপন কথা

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(২য় পর্ব)

উপরের শিরোনাম দেখেই অনেকের ভুরু কুঁচকে যেতে পারে। তবে আশংকার কোন কারণ নেই। 'আপনকথা' সাতকাহন করে লেখার কোন চেষ্টা এ লেখায় আমি করছি না। আত্মকথনে প্রায়শই অত্যুক্তি হয়ে যায়, একথা আমার অজানা নয়। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে এমন কিছু নিজের কথা এসে গেল যা ঐ প্রবন্ধে লেখার কোন সুযোগই ছিল না। এই লেখাটি লেখার সময়ে অনেকেই জানতে চেয়েছিলেন, আমি আমার 'স্মৃতিকথা' লিখছি কিনা! আজ জীবনের পঞ্চাশটি বছর অতিক্রম করে স্মৃতিকথা লেখার অধিকারী আমি অবশ্যই হয়েছি; যদিও পরিষদে আমার চেয়েও অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ এখনো রয়েছেন। তবে কে জানে, পরে আর এই 'আপন কথা' লেখার সুযোগ হবে কিনা, এই আশংকা থেকেই এখনই এটা লিখতে প্রবৃত্ত হলাম। যে সব বিনয়ী ভদ্রলোক সঙ্কোচবশতঃ নিজের কথা একদম বলতে চাননা তাঁদের চাইতে বিনয় যে আমার কোন অংশে কম, একথা কেউ যেন না ভাবেন। তবে এই 'আপন কথা' লেখার জন্য এত ব্যস্ততার কারণ কি?

এ-বই সে-বই পড়তে পড়তে হঠাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিগত দিনের এক রাষ্ট্রনায়ক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের একটি উক্তি নজরে এল: "মরে এবং হেজে যাবার পর যদি বিস্মৃত না হয়ে যেতে চাও, তবে হয় এমন কিছু লেখ যা পড়ার যোগ্য; অথবা এমন কিছু কর যা লেখার যোগ্য।" (If you would not be forgotten as soon as you are dead and rotten, either write things worth reading, or do things worth writing). আমাদের স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, এ পৃথিবীতে যদি এলি, তবে একটা দাগ রেখে যা। এ পৃথিবীতে এসে কোন দাগ রেখে যেতে পারলাম না, এটা আক্ষেপেরই কথা। গ্রন্থাগারিক হিসেবে বা গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এমন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা অন্য কোন ক্ষেত্রেরও এমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব নই যে গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা বা অন্য কেউ আমার সম্বন্ধে লিখবেন। আর যোগ্য লেখক হওয়ার জন্য যে পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন তা আমার কোন কালেই ছিল না; লেখাকে আমি এতকাল এড়িয়েই গেছি। সুতরাং আমার ভাবনা একটিই, যা লিখব তা পড়ার যোগ্য হবে তো? এই লেখার উদ্দেশ্য খুব মহান কিছুই নয়; এই পরিষদে এসে একদিন আমিও যে সামান্য কিছু কাজ করেছিলাম সেটা লিখে যাওয়ার এই প্রচেষ্টাকে আশা করি কেউ অপচেষ্টা বলে মনে করবেন না।

হঠাৎ-ই একদিন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে পড়েছিলাম। আবার হঠাৎ-ই আর একদিন সম্পাদকের কুর্সী ছেড়ে দিয়ে পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষক হয়ে গেলাম। আমার সম্পাদক হওয়ার পেছনে পরোক্ষভাবে যাঁর হাত ছিল, তিনিও একজন পূর্বতন সম্পাদক, শ্রী অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত। এটা ইংরেজী ষাটের দশকের কথা। সম্পাদক হিসেবে শ্রীদাশগুপ্তের যোগ্যতা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তাঁর ছিল একান্ত সময়াভাব। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তাঁর সমান দখল ছিল। তাঁর দুই অলিখিত সহকারী ছিলাম আমি ও প্রয়াত চঞ্চল কুমার সেন। শ্রীদাশগুপ্ত চাকুরী নিয়ে দিল্লী চলে গেলে পত্রিকার সম্পাদক হন চঞ্চল কুমার সেন। পুরো একবছরও হয়নি তখন, বার্ষিক সাধারণ সভায় চঞ্চলকুমারের নাম অন্য একটি পদের জন্য

এবং আমার নাম সম্পাদক পদের জন্য প্রস্তাবিত হয়।

শ্রী দাশগুপ্ত সম্পাদক থাকাকালে মাঝে মাঝেই আমাকে 'গ্রন্থাগার'-এ ছাপার জন্য ইংরেজী পত্র-পত্রিকা থেকে এটা-সেটা বাংলায় অনুবাদ করতে দিতেন। একবার তিনি আমাকে 'Library World'-এর একটি লেখা অনুবাদ অথবা সেটি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলেন। ঐ লেখাটি অবলম্বনে আমি লিখি 'চার্জিং প্রথার বিবর্তন'। পৌষ ১৩৬৯ সংখ্যায় এটি ছাপা হয়। আর একবার তিনি আমাকে এ আর হিউইট-এর 'ভারতের পাবলিক লাইব্রেরী আইন' বলে একটি বেশ বড় লেখা অনুবাদ করতে দেন। ১৩৭০ এর কয়েকটি সংখ্যায় এই লেখাটি প্রকাশিত হয়। এই লেখাটি নিয়ে সম্পাদককে আমি খুবই বিপদে ফেলে দিয়েছিলাম। লেখাটির দুই কিস্তি 'গ্রন্থাগার'-এ ছাপা হয়ে যাবার পর তৃতীয় এবং শেষ কিস্তি তৈরী না হওয়ায় আমি ক্রমাগত সম্পাদককে এড়িয়ে চলছিলাম। বাধ্য হয়েই সম্পাদক এই অংশটুকু নিজে অনুবাদ করে ছাপান। পরবর্তীকালে এই আমিই যে 'তণ্ডুলানন্দ' নামে সার্থকনামা হয়েছিলাম তা একেবারে নিরর্থক নয়।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক হবার পূর্বে পরিষদে আমার তেমন পরিচিতি কিছুই ছিল না বলা যায়। আমি পরিষদের কাউন্সিল, কার্যনির্বাহক সমিতি, এমন কি কোন উপসমিতিরও সদস্য ছিলাম না। তবে সম্পাদক হবার অনতিকাল পূর্বের দুটি ঘটনায় হঠাৎই আমার কিছুটা পরিচিতি হয়ে যায়। সেবারে কাকদ্বীপে অনুষ্ঠিত বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (তখন এটা সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন রূপে অভিহিত হয়েছিল) আমার একটি প্রবন্ধ 'বাংলা বিষয় নাম নির্বাচনের সমস্যা' উত্থাপনের জন্য অনুমোদিত হয়। আমার এই প্রবন্ধ রচনায় পেছন ছিল বন্ধুবর শ্রীগণেশ ভট্টাচার্যের তাড়না। তিনি আমাকে ও প্রশান্ত বন্ধুবর অজয় কুমার রায়কে আমরা সম্মেলনে কেন প্রবন্ধাদি পেশ করি না এ নিয়ে অনেক ভর্ৎসনা করেন এবং আমাদের দুজনকে দুটি প্রবন্ধ লেখার জন্য বিষয়ও নির্বাচন করে দেন। দুটি প্রবন্ধই সম্মেলনে প্রদর্শিত হয় এবং সম্মেলনের সভাপতি প্রয়াত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও প্রবন্ধ দুটি সম্বন্ধে সপ্রশংস মন্তব্য করেন। অজয়ের প্রবন্ধটি পরে 'গ্রন্থাগার'-এ ছাপা হয়। আমারটি নাকি হারিয়ে গিয়েছিল বলে ছাপা যায় নি। সম্মেলনে ঐ প্রবন্ধ পড়ার পর একজন মহিলা প্রতিনিধি নিজে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেন এবং জানান, প্রবন্ধটি তাঁর ভাল লেগেছে। ঘটনাটি হয়তো তুচ্ছ। যিনি তখন এটা জানিয়েছিলেন, আজ হয়তো এরথা তাঁর স্মরণেই নেই। কিন্তু আমার সেই প্রথম স্বীকৃতির কথা আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণে আছে। মহিলার নাম সুজাতা সেন। তিনি তখন সম্ভবত 'ডে স্টুডেন্টস হোমে' কাজ করতেন। পরবর্তীকালে ইনি ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনসের গ্রন্থাগারিক হন।

'বিষয় শিরোনাম' সম্পর্কে সম্মেলনে প্রবন্ধ পেশ করে সম্ভবতঃ ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞই হয়ে পড়েছিলাম। তাই সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্যের (প্রয়াত) 'বিষয় শিরোনাম' বইটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় সমালোচনার জন্য প্রেরিত হলে সেটির সমালোচনার দায়িত্ব আমাকেই দেওয়া হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত এই সমালোচনায় লায়বদ্ধ যতটা না ছিল, চমক ছিল তার বহুগুণ। লহজেই সমালোচনাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আমারও কিছুটা পরিচিতি হয়।

এর বেশ কিছুকাল পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কৃষ্ণময় বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। বেশ সাদা-সিধা, সজ্জন মানুষটি এবং প্রকৃত গুণী লোক। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে আমি যুক্ত জেনে উনি আমার কাছে অভিযোগ করেন যে, কে একজন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় তাঁর বইয়ের সমালোচনা করেছিল, কিন্তু তার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে নি। উনি জানতেন না যে, সেই পাবওই তখন তাঁর সামনে বসে ছিল। লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকা ছাড়া তখন আর উপায় কি! 'বিষয় শিরোনামা' নিয়ে তিনি তো তবু কিছু কাজ করেছিলেন, আর আমি কিনা সমালোচনা করেই 'হিরো'।

'গ্রন্থাগার পত্রিকার অন্যান্য সম্পাদকের মতই আমিও পত্রিকার সম্পাদন', মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রভৃতি ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ও অপেশাদার ছিলাম। পরবর্তী সম্পাদকদের মধ্যে সত্যব্রত সেন, প্রদীপ চৌধুরী ও অরুণ রায় প্রভৃতির তবু মুদ্রণ ব্যাপারে কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। আমার একমাত্র সম্বল ছিল পূর্ববর্তী সম্পাদকের অলিখিত সহকারী রূপে কিছু প্রুফ-ট্রুফ দেখে দেওয়া, লেখা-টেখা সংশোধন করার কিছু অভিজ্ঞতা। তবে আমার জীবিকার ক্ষেত্র একটি চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকার গ্রন্থাগার হওয়ায় ওখানকার অভিজ্ঞতা আমার খুব কাজে এসেছিল। ঐ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল পঞ্চার হাজারেরও ওপরে।

সম্পাদক থাকাকালীন, তার পূর্বে এবং পরেও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় আমার তেমন বিশেষ মূল্যবান কোন প্রবন্ধ ছাপা হয় নি; যেটা প্রমীলচন্দ্র বসু, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণকান্তি দাশগুপ্ত, চঞ্চলকুমার সেন, বিমলকান্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, সত্যব্রত সেন ও রামকৃষ্ণ সাহা প্রমুখ সম্পাদকদের বেলায় হয়েছে। যদিও সম্পাদক না থাকলেও তখন থেকে আজ পর্যন্ত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় নি। তবে সম্পাদক থাকা কালে তো বটেই, না থাকা কালেও বেশ কিছু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, রিপোর্ট এবং গ্রন্থ-সমালোচনা লিখেছি। সম্পাদক থাকাকালে একবার গ্রন্থ-সমালোচনায় অত্যুৎসাহ দেখিয়ে আমার রীতিমত শিক্ষা হয়েছিল। পত্রিকার সম্পাদক হবার পূর্বেই জবরদস্ত সমালোচক হয়ে উঠেছিলাম; আর পত্রিকার সম্পাদক হবার পরের তো কথাই নেই। আর আমাকে পায় কে! সমালোচনায়-সমালোচনায় ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে দিলাম। একবার সমালোচনার জন্য বই পেলেই হয়! তা যে কোন বিষয়ের বই-ই হোক না কেন! আর এসব সমালোচনা আমি নিজেই করতাম। আমি একাধারে সাহিত্য-সমালোচক, ভারত বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত, শিল্পকলা-সঙ্গীত রসিক আরো কত কি! আর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান তো আমার হাতের পাঁচ। পরিষদের প্রবীণ গুণিজন এবং অভিজ্ঞ বন্ধুরা আমাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করতেন এই বলে যে, একমাত্র গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের বই ছাড়া 'গ্রন্থাগার'-এ অন্য কোন বিষয়ের বই-এর সমালোচনা ছাপা উচিত নয়। কিন্তু নিজের বিদ্যাবত্তা প্রমাণ করার এমন অপূর্ব সুযোগ হারানোটা আমার ঠিক মনঃপুত হত না। এই সময়েই ৺সুখরঞ্জন রায় প্রণীত 'আকাশ-প্রদীপ' কাব্য গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে আমার খুব শিক্ষা হয়েছিল। আশ্বিন ১৩৭৪-এর সংখ্যায় প্রকাশিত গ্রন্থটির সমালোচনায় আমি খুব বিজ্ঞের মত লিখেছিলাম যে, এর ছন্দ ষোল অক্ষরের পয়ার অনেকটা গদ্যেরই মত'। কিন্তু আসলে আলোচ্য গ্রন্থটিতে ছিল বিভিন্ন ছন্দের সন্নিবেশ এবং এতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরই প্রাধান্য ছিল। গ্রন্থকারের পুত্র শ্রীমিহির রায় আমাকে এক পত্র লিখে জানতে চান এটা কি করে সম্ভব হল?

এখন এরকম একটা ভুল কি করে ঘটল তা খুলে বলি। সমালোচ্য বইটি সমালোচকের আদ্যোপান্ত পাঠ করাই উচিত। কিন্তু এই অতি ব্যস্ততার যুগে অতি অল্প সংখ্যক সমালোচকই সমালোচনার এই নীতি মেনে চলেন। এই বইটির শেষে লেখকের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত জনের অভিমত সন্নিবেশিত হয়েছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র হয়ে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমি যে একেবারে অজ্ঞ ছিলাম, একথা বলা চলে না। সময়াভাবে বইটির আদ্যোপান্ত না পড়ে শুধুমাত্র অপরের সমালোচনা পড়ে সংক্ষেপে কাজ সারতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শুক্লা'র ছন্দের সঙ্গে 'আকাশ-প্রদীপে'র ছন্দ গুলিয়ে ফেলে আমি এই মারাত্মক ভুলটি করে বসি। পরবর্তী সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩৭৪) অবশ্য 'ভ্রম-সংশোধন' করেছিলাম। কিন্তু তাহলে কি হবে! নাক-কান যা কাটা যাবার তা তো কাটা হয়েই গেছে! অতএব নিজের নাক-কান মলে (কাটা নাক-কানের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল) এমন কাজ আর করব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

এই রকমই অত্যুৎসাহ আমার ছিল 'চিঠিপত্র' বিভাগে

চিঠি ছাপানোয়। কারো কাছ থেকে চিঠিপত্র পেলেই কোন বিচার-বিবেচনা না করেই আমি তা 'গ্রন্থাগার'-এ ছাপিয়ে দিতাম। বন্ধু-বান্ধবেরা এ নিয়ে আমাকে বিস্তর ঠাট্টা করতেন। বিশেষ করে, পত্রটিতে যদি সম্পাদকের প্রশংসা করে কিছু লেখা হত। যেমন, 'আপনার সুযোগ্য পরিচালনায় 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম', ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখন চিঠিগুলো সব সময়েই যে এরকম প্রশংসা থাকত তা নয়। মাঝে মাঝে পত্র-লেখকেরা চিঠির মাধ্যমে হুঁসও ফোটাতেন। এ সময়ে 'গ্রন্থাগার'-এ ছাপার জন্য বহু চিঠিপত্রই পেতাম। সকলের চেয়ে বেশী এবং ঘন ঘন পত্রাঘাত করতেন কোন্নগর থেকে শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাকড়দহ, হাওড়া থেকে শ্রীবিমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

সদস্যদের কাছ থেকে নানা ধরণের চিঠিপত্র আসুক এটা আমিও চাইতাম। আর তা ছাপিয়ে দিয়ে তাঁদের উৎসাহ বর্ধন করতেও আমি চাইতাম। তবে সব চিঠিই যে ছাপানোর যোগ্য হত তা নয়। এজন্য অনেক সময় চিঠি সংক্ষেপ করে ছাপা হত। লঘু ও গুরু বিষয়ে, আকারে হ্রস্ব ও দীর্ঘ সব রকমের চিঠিই আসত সম্পাদকের দপ্তরে। যেমন, ভাদ্র ১৩৭৩ (পৃ: ২৪৫) সংখ্যায় 'ঘটনের শুভার্থীর পত্র' ছিল মাত্র দু'লাইনের। আশ্বিন ১৩৭৩ (পৃ: ২৭৯-২৮৩) সংখ্যায় বাণী বসুর 'একটি প্রস্তাব' ছিল পাঁচ পৃষ্ঠায়। এটি চিঠির আকারে আসলে প্রবন্ধই। সম্পাদক হয়েই ১:৭২-এর শ্রাবণ সংখ্যায় আমি চিঠিপত্র ছাপানোর নিয়ম-কানুন সংক্ষেপে দিয়েছিলাম। পরে কোন কোন সংখ্যায় অন্যান্য বিভাগগুলির নিয়ম-কানুন ও সংক্ষেপে উল্লেখ করি। গ্রন্থাগারিকদের অভাব-অভিযোগ, সভানমিতির বিবরণ, ব্যক্তিগত নিয়োগ বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি সংবাদ প্রকাশের জন্য 'গ্রন্থাগারিক সংবাদ' বলে একটি নতুন বিভাগ চালু করা হয়। 'পরিষদ কথা'র কেবলমাত্র পরিষদ সংক্রান্ত সংবাদই ছাপা হবে বলে স্থির হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সংবাদের এই সীমারেখা খুব কমই মানা হয়েছে। সম্ভবত সংবাদের অভাবেই বিভাগগুলি সব একে একে উঠে গেছে।

যে সময়ে 'গ্রন্থাগার'-এ ছাপার জন্য যেসব চিঠিপত্র আসত তার অধিকাংশই হত মামুলি ধরণের। বেশির ভাগই তার গ্রন্থাগারিকদের অভাব-অভিযোগ সংক্রান্ত। ভিন্ন স্বাদের চিঠিপত্র যে একেবারেই আসত না তা নয়। তবে সেগুলি সংখ্যায় ছিল বড় কম। এগুলির মধ্যে পত্রিকার ভুলভ্রান্তি, বা পত্রিকায় প্রকাশিত কোন লেখার বক্তব্য খণ্ডন করে পত্রাদিও আসত। ১৩৭৫ সালে বালুঘাট সম্মেলনের ওপর 'সম্পাদকীয়' প্রবন্ধ এবং সুচিত্রা ঘোষের (পরে গঙ্গোপাধ্যায়) একটি 'প্রতিবেদন' নিয়ে বিস্তর 'চাপান-উতোর' হয়েছিল পর পর তিনটি সংখ্যায়। শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধের প্রবীণচন্দ্র বসু মহাশয় ঐ সংক্রান্ত চিঠি আর না ছাপাতে বলে আমাকে একটি চিরকুট লিখে পাঠান। মাঝে মাঝে দু'একটি সাহিত্য গুণান্বিত, স্নেহ ও যুক্তিপূর্ণ, সংযত ও সংহত এবং উপভোগ্য চিঠিও পাওয়া যেত। একবার এই রকমের একটি চিঠি এসেছিল সিউড়ি বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবনের সম্পাদক শ্রী শ্রীচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের কাছ থেকে তাঁর প্রেরিত সংবাদ প্রকাশে কিছু অর্থ বিভ্রাট হওয়ায় (পৌষ ১৩৭৩ পৃ: ৪৫৭) এবং আর একটি ব'াচি বুটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী থেকে সুরেনবন্ধু রায়ের কাছ থেকে, 'গ্রন্থাগার' এর অধিকাংশ লেখাই যে বাংলেজী ভাষায় লেখা হয় (অর্থাৎ ইংরেজী বাংলা মিশ্রিত) তার প্রতিবাদে (বছর এবং সংখ্যাটি উল্লেখ করা গেল না)। বলা বাহুল্য, সদস্যদের এই পত্রাদিগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। 'গ্রন্থাগার' সদস্যরা পড়েন কিনা তারও কিছুটা আঁচ করা যায় এইসব পত্র থেকে। তবে অভাব-অভিযোগ ছাড়া বৃত্তিমূলক সমস্যাদি বা পত্রিকার প্রবন্ধাদি নিয়ে খুব বেশী চিঠিপত্র পরবর্তীকালেও ছাপা হয়নি। পৌষ ১৩৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমনঙ্গ মোহন ভট্টাচার্যের এবং ভাদ্র ১৩৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী গোবিন্দ গোপাল চৌধুরী ও শ্রী বিমলকান্তি সেনের (বছর এবং সংখ্যা উল্লেখ করা গেল না) এই ধরণের কয়েকটি পত্র কখনো-

লখনৌ নজরে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও সে সময় কেউ কেউ আমাকে পত্র লিখেছিলেন। তার মধ্যে গ্রন্থাগার জগতের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন। একবার দিল্লী থেকে শ্রীযুক্ত বি এস কেশবন আমাকে চিঠি লিখে 'গ্রন্থাগার'-এ প্রকাশিত মহীশূর ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের রিপোর্ট লেখিকা শ্রীমতী ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান। এই চিঠিতে 'গ্রন্থাগার' সম্পাদকের ঠিকানাও লেখা হয়েছিল এইভাবে: শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক 'গ্রন্থাগার'। এটি শ্রীযুক্ত কেশবনের পি. এ.-র কাণ্ডও হতে পারে। আর তা হলেও তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সে সময়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমতী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় নামে সত্যিই একজন অধ্যাপিকা ছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবনকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছিলাম, ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায় এবং আমি দুজনেই শ্রীমতী নই, শ্রীমান। অবশ্য এ চিঠির আর কোন উত্তর তাঁর কাছ থেকে পাইনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীযুক্ত কেশবন বরাবরই 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছেন। নব পর্যায়ে 'গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রকাশে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন এবং প্রায়শই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পত্রিকা-সম্পাদক সৌরেন্দ্র মোহনকে অভিনন্দন পাঠাতেন।

বারাণসী থেকে একবার শ্রীযুক্ত পৃথ্বিনাথ কাউলা আমাকে চিঠি লিখে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সারসংক্ষেপ, অন্তত পক্ষে সূচিপত্র ইংরেজীতে দিতে অনুরোধ করেন। বাংলা ভাষা যাঁরা বোঝেন না, তাঁদের পক্ষে তাহলে প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানার সুযোগ হয়। এ ধরণের অনুরোধ সর্ব ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়েও কারো কারো কাছ থেকে পেয়েছিলাম। আমি সম্পাদক হবার পরেই মাঘাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে সূচিপত্র ছাপতে শুরু করি। শ্রীকাউলা হয়তো চিঠি লেখার সময় 'গ্রন্থাগার'-এর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেন নাই। কারণ তাঁর চিঠি এসেছিল এর অনেক পরে। ইংরেজী সারসংক্ষেপ দেওয়া অবশ্য চালু হয় অনেক পরে বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনাকালে।

আর একবার দিল্লী থেকে প্রয়াত নারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয় 'গ্রন্থাগার'-এর প্রচ্ছদ সম্পর্কে লিখেছিলেন। তিনি হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন এবং এর কিছুকাল পূর্ব থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ শুরু হয়। সম্মেলনে উপস্থিত হলে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপও হয়। উনি 'গ্রন্থাগার' এর প্রচ্ছদ সম্পর্কে বেশ কিছু পরামর্শ দেন এবং বলেন, 'গ্রন্থাগার'-এর প্রচ্ছদ ভালো হওয়া উচিত। সে সময়ে 'গ্রন্থাগার-এর প্রচ্ছদ যাঁরা আঁকতেন (সবসময়েই কেউ কেউ) তাঁদের নাম দেওয়ার কোন রেওয়াজ ছিল না। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীর তখন সেনগুপ্ত কয়েকবার 'গ্রন্থাগার-এর প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন। উনবিংশ বর্ষে আমার সম্পাদিত 'গ্রন্থাগার'-এর শেষ সংখ্যাটির (বৈশাখ, ১৩৭৬) প্রচ্ছদ বিনা পারিশ্রমিকে এঁকে দেন প্রখ্যাত শিল্পী খালেদ চৌধুরী। এই প্রচ্ছদটি পরেও বেশ কয়েক বছর চলেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে নব পর্যায়ে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রচ্ছদের বেশ বৈচিত্র্য ছিল। বিশেষ করে বিষয়ানুযায়ী এক একটি সংখ্যায় অনেক স্কেচ এঁকেছেন শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যায়ও রবীন্দ্রনাথের স্কেচটি তিনিই করেন। এতে তাঁর নাম ছিল না। প্রয়াত সন্তোষ বসুও 'গ্রন্থাগার'-এর জন্য কিছু স্কেচ এঁকেছেন।

চরুলতুমারের পরে আমি যখন সম্পাদক হই তখন পত্রিকায় ছাপার মত একটি লেখাও ছিল না। আমি একটা নোটবই নিয়ে তখন পর্যন্ত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের বেশির ভাগ লেখকের ঠিকানায় পোষ্টকার্ড ছাড়লাম লেখা চেয়ে। খুব একটা সাড়া না পেলেও দু'একজন জানালেন যে তাঁরা লেখা পাঠাবেন। ত্রিপুরার আগরতলা থেকে লেখা পাঠাতেন শ্রীবনবিহারী মোদক। তাঁর বেশ কয়েকটি লেখা তখন 'গ্রন্থাগার'-এ

বেরিয়েছে। তাঁর লেখা আমার খুবই ভাল লাগত। তাঁর কাছে লেখা চেয়ে আমি একটি চিঠি দিলাম। বনবিহারীবাবু খুব মজার কথা লিখলেন। উনি লিখলেন, 'সম্পাদক হিসেবে আমি সৌরেনবাবুকেই চিনতাম। আপনি আবার কে সম্পাদক হয়েছেন, আমি জানি না। 'গ্রন্থাগার'-এ আমি অনেক লিখেছি, আর লিখব না।' সম্ভবতঃ সৌরেনবাবুর পরেও দুজন সম্পাদক চলে গিয়ে তৃতীয় একজনের জমানা যে তখন চলেছে এ খবরই তিনি রাখতেন না। দিব্যি লেখা পাঠিয়ে যাচ্ছিলেন। চারুপ্রকাশের সময়েও তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে। আমি তাঁকে একথা জানিয়ে না দিলে হয়তো আমাকেও লেখা পাঠাতেন। যাই হোক, চারুদাকে এবং আমাকেও সংকটে যিনি ত্রাণ করেন তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়। এই সময়ে তিনি স্বনামে ও বেনামে অনেক লেখাই লিখেছিলেন। তারপর ছিলেন শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রয়াত) মহাশয়। তিনিও ধারাবাহিক ও অন্যান্য রচনা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স অনেক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাঁর উদ্যম ও উৎসাহ ছিল যুবকের মত। সৌভাগ্যক্রমে আর একজন তরুণ লেখককে পেয়েছিলাম। ইনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পঙ্কজ কুমার দত্ত। ইনিও ঐ সময়ে ধারাবাহিকভাবে 'গ্রন্থাগার'-এ লেখেন। ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বনে কয়েক কিস্তি লিখেছিলেন সাহিত্য সংসদের শ্রী সোলকেন্দু ঘোষ। ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখানো অরুণ রাশগুপ্তের কাছ থেকে আমার লেখা। ক্রতারা লিখেছিলেন, মহীশূরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলন সম্পর্কে। মোটামুটি এঁদের লেখা দিয়ে আমার প্রথম সংখ্যাটি (আষাঢ়, ১৩৭২) বেরিয়ে গেল। তারপর একে একে লেখা পেয়ে আমি খানিকটা সাহসে উঠেই একটি 'পঞ্চদশ বর্ষ পূর্তি সংখ্যা' বের করার আয়োজন করতে লাগলাম। এ সংখ্যাটিতে অনেক বিশিষ্ট লেখকের লেখাই পেয়েছিলাম (বৈশাখ, ১৩৭৩)।

আমার সম্পাদিত প্রথম সংখ্যাটির সম্পাদকীয়টি কিন্তু লিখেছিলেন প্রয়াত চারু কুমার সেন। তার পরের সংখ্যা থেকে অবশ্য আমি নিজেই সম্পাদকীয় লিখি। এ সময়ে আমি বেশ বড় বড় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতাম। ও বিংবা তার পাতার সম্পাদকীয় তো হামেশাই হত। পরবর্তীকালে যেমন একই সংখ্যার দুজন সম্পাদক হয়েছেন যেখা যায়, আগে একেম কখনো হত না। সৌরেন্দ্রমোহন তাঁর পূর্ববর্তী সম্পাদক শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ সংখ্যাটি বার করেন। কিন্তু এতে তাঁর কোন নাম ছিল না। সৌরেন্দ্রমোহনের অন্তিম সংখ্যাটি অরুণ রাশগুপ্ত বার করেছিলেন কিনা জানি না, তবে অরুণকুমার রাশগুপ্তের শেষ সংখ্যাটি কিন্তু বার করেন চারু কুমার সেন। আমার অন্তিম সংখ্যাটি অবশ্য আমি নিজেই করেছিলাম। লিখিত বা অলিখিত সহকারী আমার সময়েও কেউ কেউ ছিলেন, বিমলচন্দ্র, সীতা ও অমিতা মিত্র এবং আরো অনেকে। নিয়মিত গ্রন্থাগার সংবাদ তৈরী করে দিতেন কৃষ্ণা দত্ত। তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও আমি তাঁর নাম গ্রন্থাগার-এর পৃষ্ঠায় ছাপিয়েছিলাম।

এই সময়ে আর একটি বিশেষ সংখ্যা বার করেছিলাম 'সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার' বিষয়ে (মাঘ, ১৩৭৪)। আমাদের বন্ধু গৌরীহরই একজন ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা-বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক, প্রয়াত সন্তোষ কুমার বসু। ইনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করেন এবং সে সময় 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধও লেখেন। ইনি পরিষদের গ্রন্থাগারের অবৈতনিক গ্রন্থাগারিকও হয়েছিলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে এঁকে 'মিস মহম্মদ' বলে ডাকতাম। মিস মহম্মদের ছিলটি খুবই বড় ছিল। 'সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার' সংখ্যাটি এঁর উৎসাহেই প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল। লেখাগুলি ইনিই সংগ্রহ করে দেন। লেখকদের কেউ কেউ ছিলেন তাঁর মিউজিওলজি বিভাগের ছাত্র। শুধু 'গ্রন্থাগার'ই নয় এর আগ্রহেই আরও দু'একটি পত্রিকাও সে সময় আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পরিষদ (I COM) কর্তৃক আহূত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অভিযান (১৯৫৭-৬৮)

উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। মনে পড়ে, পরিষদের হরদয়াল লেনের অফিস থেকে রাত্রি ন'টা সাড়ে ন'টায় বের হয়ে আমরা দুজন অধিক রাত্রি পর্যন্ত মধ্য কলকাতার রাস্তায় গল্প করতে করতে একবার তাঁর বাড়ীর দিকে আর একবার আমার বাড়ীর দিকে উভয়ে উভয়কে পৌঁছে দিতে যেতাম। এই অফুরন্ত উদ্যম ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর মানুষটির জীবন শেষ দিকে অশেষ দুঃখময় হয়ে ওঠে পারিবারিক কারণে। হতোদ্যম এবং ভগ্নহৃদয়ে মাত্র কিছুকাল আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীতে একজন 'ওল মহম্মদ'ও ছিলেন। আজ আমরা তাঁর ঐ নাম আড়ালে-আবডালেই বলতাম। তিনি 'ওল সন্ন্যাস' শ্রীগুরুশরণ দাশগুপ্ত। সকলেই জানেন, এ ওল সে ওল নয়, কাশী গোলাপফুল বা 'ফুল' এর অর্থ নয়। বাংলা 'ওল' বা ওল মাত্রা বোধ হয় এসেছে গুলিখোরদের মিথ্যা, আজগুবি কল্পনা করা থেকে। 'প্রাগার' পত্রিকার সম্পাদক হবার কিছু পরে-পরেই আমরা আমাদের মধ্য কলকাতার বাসা বদল করে বেলঘরিয়ায় চলে আসি। এখানে ঠিক প্রতিবেশী না হলেও শ্রীদাশগুপ্তের বাসা আমাদের কাছাকাছিই ছিল। একসময় শ্রীদাশগুপ্ত পরিষদের সহকারী কর্মসচিব ছিলেন। তাঁর বিবাহ উপলক্ষে কিছুকাল আগে তাঁর শ্বশুরবাড়ি কলকাতা থেকে আমরা তাঁর পরিষদের বন্ধুরা অনেকেই গিয়েছিলাম। গুরুশরণ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন তোয়াক্কা না করেই আমার স্ব-নিয়োজিত অভিভাবক হয়ে উঠলেন। তাঁর স্বভাবটাই ছিল এমন। কারো কোন উপকার করার উদ্দেশ্য না থাকলেও তাঁর কাজের পরিণাম অনেক সময় হয়ে যেত 'হিতে-বিপরীত' গোছের। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে নিয়ে গিয়ে আমি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, কাগজের 'সম্পাদক' ইত্যাদি পরিচয় দিতেন। আমি বড়ই লজ্জিত এবং বিরক্ত হতাম, কিন্তু গুরুশরণের হাত থেকে আমার পরিত্রাণ ছিলনা। আর সাহিত্যিক, শিল্পী, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ্ পৌরপ্রধান প্রমুখ কত লোকের সঙ্গে যে তাঁর আলাপ ছিল তার ঠিক নেই। কি করে যে তিনি এঁদের পটাতেন তিনিই জানেন। বর্তমানে তিনি সল্টলেক নিবাসী হয়েছেন।

চিকিৎসা-শাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থাগারে কাজ করার সুবাদে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত The Lancet নামের সাপ্তাহিক পত্রিকাটি আমার গ্রন্থাগারে নিয়মিত দেখতাম। এর 'In Engand Now' স্তম্ভটি আমার পড়তে খুবই ভাল লাগত। এ থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় আমি ভণ্ডুসানন্দ শর্মার প্রতিবেদন লিখতে শুরু করি। ভণ্ডুসানন্দ যে স্বয়ং গ্রন্থাগার সম্পাদক একথা অনেকদিন পর্যন্ত গোপন ছিল। পরে এই ভণ্ডুসানন্দ কে তা প্রকাশ হয়ে পড়তেই গুরুজন-লঘুজন নির্বিশেষে কেউ আমাকে 'ভণ্ডুস' কেউ বা 'ভণ্ডুসদাদা' বলে ডাকা শুরু করলেন। উপরে বর্ণিত দু'জন বন্ধুর মত আমিও একটা উপ-নাম পেয়ে গেলাম। একবার কোন কাজ উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে আমাদের গ্রন্থের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের চোখ আমার দিকে পড়তেই বলে ওঠেন, 'এই যে ভণ্ডুস, কি খবর?' ঈষৎ লজ্জিত হলেও এই স্বীকৃতি আনন্দ দিয়েছিল বই কি!

ভণ্ডুসানন্দ শর্মার প্রতিবেদন নিয়ে সে সময়ে গ্রন্থাগার পরিষদে খুব বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। পরিষদের মুখপত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বহির্ভূত এ ধরণের লেখা প্রকাশ করা উচিত কিনা, এর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেকেই তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। তবে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বন্ধুবর শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য। 'গ্রন্থাগার পরিষদের পত্রিকায় এ রকম হালকা, বাজে জিনিস ছেপে তোমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে জাহান্নমে পাঠাচ্ছো।'—ব্যাঙ্গালোর থেকে এ ধরণের একটি ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ-পত্র তিনি পাঠিয়েছিলেন। যাই হোক্, সময়ে সবই সয়ে যায়। পরবর্তীকালে কেউ কেউ জানিয়েছেন যে, লেখাগুলি তাঁরা পছন্দ করতেন। এমন কি, এর অনেককাল পরেও অনেকে আমাকে এই ধরণের লেখা আবার লিখতে অনুরোধ করেন।

পরিষদে আমাদের একটি চালু ঠাট্টা ছিল যে 'গ্রন্থাগার'

পত্রিকা পড়েন সম্পাদক নিজে, প্রেসের প্রুফ তিনিই এবং তাঁর লেখা ছাপা হয় তিনি অন্যান্য লেখাগুলি বাদ দিয়ে শুধু নিজের লেখাটিই পড়েন, বোধ হয় ছাপার অক্ষরে লেখাটির কেমন খোলতাই হয়েছে সেটি একবার দেখে নিতে। ঠাট্টা হলেও কথাটি যে একেবারে ভিত্তিহীন, একথা বলা যায় না। পরিষদের ক'জন সদস্য নিয়মিত 'গ্রন্থাগার' পড়েন, সে পরিসংখ্যান নেবার হয়তো সঠিক উপায় নেই। তবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা আজ না হোক্ আগামীকাল সেটা উদ্ভাবন করবেনই। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, সদস্যদের সতুকরা দশজনও বোধহয় নিয়মিত পত্রিকাটি পড়েন না। এ রকম আশঙ্কা থেকেই বোধহয় বর্তমানে এই পত্রিকায় অনেক লেখককে দেখা যায় তাঁদের প্রবন্ধের 'নব নব রূপে এসো' 'পুরোনো সেই দিনের কথা', 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু' 'ভাষার অবগুণ্ঠন', ছোট ঘরে তাবি' ইত্যাদি আকর্ষণীয় নাম দিয়ে থাকেন। কখনো বা নীরস ও গুরুভার বক্তব্যকে সরস ও হালকা করে যেন সেগুলি পঠিত হবে এই আশায়। অনুসন্ধানের লেখাগুলি যে অন্ততঃ সে সময়ে পঠিত হত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীরই আর একজন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ ক্লাসে আমার সহপাঠী শ্রীদিলীপ বসু ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ইয়ারলিকেও আমার সতর্কমী। বন্ধু হলেও বি.এল.এ এবং ইয়ারলিকে নানা বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে হামেশাই মতদ্বৈধ হয়ে প্রবল বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হত। 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদক রূপে আমার কার্যকালের শেষ বছরে 'গ্রন্থাগার' ও প্রকাশন সমিতির সভায়,"—'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে যে সম্পাদক অক্ষম, তিনি পরিষদের পত্রিকায় আজে-বাজে লেখা ছাপিয়ে পরিষদের পয়সা নষ্ট করেন কোন মুখে"— ইত্যাদি বলে তীব্র ভাষায় তিনি আমাকে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি টেবিল চাপড়ে আরও বলেছিলেন, 'এই সম্পাদকের কুর্সী ছেড়ে দেওয়া উচিত।' দিলীপ বসু ব্যাঙ্কের গ্রন্থাগারিক ছিলেন এবং পরে ইয়ারলিকের কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। টাকা-আনা-পাই নিয়েই ছিল তাঁর কারবার। পাই পয়সা পর্যন্ত হিসেবে তিনি যেমন দক্ষ ছিলেন তেমনি সাহিত্যের কচকচি সম্বন্ধে ছিল তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণা। এরপর যখন পরিষদের সকলের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে পত্রের বারের জন্য আমি আর সম্পাদক থাকতে চাইলাম না তখন সবাই ভেবেছিলেন এর কারণ বোধ হয় সেদিনকার সেই ঘটনা। কিন্তু এর আসল কারণ অবশ্যই তা ছিল না। মতান্তর হলেও আমাদের মধ্যে মনান্তর কখনো হয়নি। দিলীপ বসু আজও আমার বন্ধুই আছেন। তবে এর কারণ ছিল বোধ হয় আরও গভীরে।

পরিষদে আমার এইসব বন্ধুদের মধ্যে বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত খুঁৎখুঁতে স্বভাবের, পরম তার্কিক এবং কঠোর সমালোচক ছিলেন। ছিলেন অর্থাৎ তখনকার দিনে তিনি তাই ছিলেন। এখন বয়স বেড়ে যাওয়ায় যদি তাঁর স্বভাবের কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে তবে আমি আমার এই মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। তবে তিনি এখনো নিশ্চয়ই বর্তমান এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-শিক্ষণ বিভাগের একজন সফল শিক্ষক। তাঁর মতই গ্রন্থাগারিক থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকে পরিণত হয়েছেন আমাদের বন্ধুদের মধ্যে প্রবীর রায় চৌধুরী ও মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ। এ লেখায় অবশ্য আমি আমার পরিষদের বন্ধুদের সম্বন্ধে লিখতে বসিনি। তাহলে আমার বন্ধু মঙ্গলপ্রসাদের কাণ্ডকারখানা নিয়েই একটি বই লিখে ফেলা যেত! বিজয়পদর প্রথম এস যে ভুল তা হল, 'গ্রন্থাগার'-এ তাঁর একটি লেখা নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর একবার খুব তর্কাতর্কি হয় এবং এই তর্কে শেষ পর্যন্ত আমাকে হার স্বীকার করতে হয়। বিজয়পদ 'জনৈক' (জনৈক নয়) ছদ্মনামে 'গ্রন্থাগার'-এ লিখতে চাইলে এই তর্কাতর্কির সূচনা হয়। আমার বিবেচনায় 'জনৈক' শব্দটি অভিধানে নেই। সুতরাং এটা ব্যবহার করা চলে না। আর ব্যবহার করলে পাঠকরা ভাববেন আসলে এটা 'জনৈক'ই হবে, পত্রিকার ভুল করে ছাপা হয়েছে। বিজয়পদর যুক্তি, ছদ্মনামের যে কোন অর্থ থাকবেই এমন কোন

কথা নেই। ছন্দের খাতিরে মহাকবি কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখও তাঁদের লেখায় অনেক অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। পত্রিকায় লেখা ছ'পাতে হলে সে 'অনেক' নামেই লেখা ছাপাবে, 'অনৈক' নামে কখনই নয়। অতঃপর 'অনেক' নাম দিয়েই 'গ্রন্থাগার'-এ বিজয়পত্র লেখা ছাপা হয়।

সেকালে পরিষদে এ রকম তার্কিকের সংখ্যা কম ছিল না; এখনও পর্যন্তও কিছু কম নেই। একে 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' না বলে অনায়াসেই 'বঙ্গীয় তার্কিক পরিষদ' বলা যেত। আমাদের বন্ধু গুরুসদয় দাশগুপ্ত কয়েকজনকে নিয়ে একসময়ে সত্যিই একটি 'বঙ্গীয় তার্কিক পরিষদ' গঠন করেছিলেন। প্রৌঢ় অবস্থায় তিনকড়ি দত্ত এবং অনাথবন্ধু দত্ত যখন দন্তহীন মুখে প্রচণ্ড বিতর্ক জুড়ে দিতেন তখন তাঁদের অর্ধেক কথাই বোঝা যেত না। এঁদের পরে সর্বশ্রী ফণিভূষণ রায়, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণীদি, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী-বিশ্বাস গণেশ ভট্টাচার্য, অরুণকান্তি দাশগুপ্ত এঁদের কেউই কম তার্কিক ছিলেন না। পরবর্তীকালেও আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যেও সকলেই অল্প-বিস্তর তার্কিক ছিলেন। আর আমাদের পরবর্তীকালে যে চারজন তর্কে খুবই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা হলেন সর্বশ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, ভুবনকান্তি সান্যাল, হিংগে দত্ত এবং অরুণ রায়। কারো সাধ্য ছিল না এঁদের তর্কে পরাস্ত করে। সে সময়ে হজুরিমল লেনে পরিষদের অফিসের অল্পপরিসর কক্ষে এই গ্রন্থাগার সম্পর্কে কাজ করতে হত ঘুঘুস তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই। নিজ বাসস্থলেও একগাদা লোকের মধ্যে তার কাজ করার কোন পরিবেশ ছিল না।

সোড়াতে 'গ্রন্থাগার ও প্রকাশন, এই দুটি উপসমিতি ছিল। কিন্তু আমি 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদক হওয়ার পরে এ দুটি উপসমিতিকে এক করে দেওয়া হয়। প্রকাশন উপসমিতির 'ডাইরেক্টরী' প্রকাশ করার পর বিশেষ কোন কাজ ছিল না। 'গ্রন্থাগার' ছাড়া অন্য যা কিছু প্রকাশিত হত তার প্রকাশের ভার 'গ্রন্থাগার' সমিতিই গ্রহণ করতেন। এজন্যই দুটি উপসমিতিকে এক করে 'গ্রন্থাগার' ও প্রকাশন উপসমিতি নাম দেওয়া হয়। আমি তখন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার সুবাদে 'গ্রন্থাগার' ও প্রকাশন উপসমিতির কর্মসচিব। বাণীদি একবার ঝড়ের বেগে পরিষদের হজুরিমলের অফিসে এসে সবসমক্ষে আমাকে খুব তিরস্কার করেন। তাঁর বই 'বাংলা শিশু সাহিত্য' গ্রন্থপঞ্জী'-র কিছু কপি পরিষদের অফিসে উইয়ে কেটে ফেলেছিল। হজুরিমল লেনেই পরিষদ অফিসের অদূরে ছিল বাণীদির বাসা। সুতরাং এ সংবাদ বাণীদির কাছে অনতিবিলম্বেই পৌঁছে যায়। এর মাত্র-কয়েকদিন পরেই আবার অনুতপ্ত বাণীদি পরিষদ অফিসে এসে সবসমক্ষে আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে যেন।

আর একবার সৌরেন্দ্রমোহনের সঙ্গে আমার মুদ্রণ সংক্রান্ত ব্যাপারে খুব তর্কাতর্কি হয়। আমি পূর্ববর্তী সম্পাদক হিসেবে খুবই সরল ছিলাম বলে তিনি অবশ্যই আমাকে নানা পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। তবে তিনি স্বভাবে বিনয়ী এবং ভদ্রই ছিলেন; হয়তো বা একটু লাজুক প্রকৃতিরও ছিলেন। অবশ্য এখন বয়স হয়ে যাওয়ায় তাঁর তখনকার স্বভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর সঙ্গে এই তর্কাতর্কি হওয়ার কিছুদিন পরে তিনি একদিন কলেজস্ট্রীট পাড়ার পুরানো বইয়ের দোকান থেকে 'দি ইস্টার্ন টাইপ কাউণ্ডার্স এণ্ড ওয়ারেক্টোল ফিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী নরেন্দ্র নাথ দে প্রণীত দু খণ্ডের 'প্রিন্টার্স গাইড' কিনে নিয়ে এসে আমাকে উপহার দেন এবং বলেন, আমি আগে ঐ দুখণ্ড বই ভালো করে পড়ে নিয়ে যথোচিত জ্ঞান অর্জন করে তবেই যেন তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে প্রবৃত্ত হই। অবশ্য সৌরেন্দ্র মোহনের একটি উপদেশ আমি অবশ্যই গ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমাকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ অথবা বড় না করে তা অন্ততঃ দুই পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বলেন এবং ঐ বিষয়ে এক একটি লেখা লিখে আনাতে 'গ্রন্থাগার'-এ ছাপাতে বলেন। তাঁর

উপরোধবশত আমি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দু'পৃষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা শুরু করলাম কিন্তু পুরুষত্বাবে ঐসব বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে নিজের নাম দিয়ে কখনো ছাপাই নাই।

'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদকরা কোন সময়েই কেবলমাত্র 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদকই ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন পরিষদের নেতৃস্থানীয়দেরই একজন। 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদনা ছাড়লেও অন্তভাবে তাঁরা পরিষদের নেতৃত্ব দিতেন। আমার বেলায় সেটা হয় নি কারণ বিশেষ গ্রন্থাগারে কাজ করার সুবাদে পত্রিকা সম্পাদক হবার পূর্বেই ইয়াসলিকে আমার যাতায়াত শুরু হয়। 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদনা ছাড়ার পর পরিষদের শিক্ষক হয়েছিলাম। তারপর বছরের পর বছর 'গ্রন্থাগার' ও 'শিক্ষণ' এই দুটি উপসমিতিতে এবং পরিষদের কাউন্সিল ও কার্যনির্বাহক সমিতিতেও নির্বাচিত হতাম; কিন্তু আমার আসল কর্মক্ষেত্র হয়ে পড়েছিল আর একটি গ্রন্থাগার পরিষদ, সেটি সর্বভারতীয় পরিষদ 'ইয়াসলিক'। এখানেও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সম্পাদনা ও মুদ্রণের অভিজ্ঞতা আমার কাজে এসেছিল। ১৯৬০ সালে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ইয়াসলিকের সর্ব ভারতীয় সম্মেলনের পূর্বে আমাদের শিক্ষক প্রয়াত গোবিন্দভূষণ ঘোষ ও প্রয়াত অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের আগ্রহে আমি, প্রবীর রায়চৌধুরী, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ প্রভৃতি আমরা কয়েকজন ইয়াসলিকের ছাত্র-সমস্ত হই এবং সম্মেলনের কাজ করি। ১৯৬৩ সালে ইয়াসলিকের অ্যালবার্ট হলের অফিসে আমার ঘনঘন যাতায়াত শুরু হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে ইয়াসলিক স্টাডি সার্কল প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে আমি নিয়মিত যোগ দিয়েছি। তখন এই আলোচনা-চক্রের মাসিক অধিবেশন নিয়মিত হত এবং তাতে কমপক্ষে ১০-১২ জন সদস্য উপস্থিত হতেনই। মূলবক্তা তাঁর বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে আনতেন এবং সেটা সভায় পাঠ করার পর তার ওপর আলোচনা হত। তখন আমি নতুন 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদক হয়েছি। আমাকে একটি সভায় মূলবক্তা হ'তে অনুরোধ করা হল। সময় না হয়ে কোন উপায় নেই দেখে আমি অবশেষে সম্মত হলাম। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্রপত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনা' নামে আমার প্রবন্ধটির অর্ধেক মাত্র লেখা হয়েছিল। সেটা পত্রিকা পরিচালনা অংশ না সম্পাদনা অংশ এখন ঠিক মনে নেই। এই সভাগুলির বিবরণ তখন 'ইয়াসলিক বুলেটিন' এবং পরবর্তী কালে 'ইয়াসলিক নিউজ লেটার' প্রকাশিত হলে 'নিউজ লেটারে' প্রকাশ করা হত। ঐ সভার অর্ধ সমাপ্ত প্রবন্ধই আমি পড়েছিলাম এবং সকলে অনুরোধ করেছিলেন সেটি সমাপ্ত করে করে আমি যেন ইয়াসলিক বুলেটিনে দিই ছাপার জন্য। অবশ্য সে প্রবন্ধ আমার আর শেষ করা হয়নি। এই সংবাদটি আমি 'গ্রন্থাগার'-এর ভাদ্র, ১৩৭৩ সংখ্যায় 'গ্রন্থাগারিক-সংবাদ' বিভাগেও (পৃঃ ২৯২) ছাপাই।

১৯৬৭ সালে 'ইয়াসলিক 'নিউজলেটার'-এর জন্ম হলে এর প্রথম সম্পাদক হয়েছিলেন শ্রী এইচ এন আনন্দরাম এবং ১৯৮০ সালে এর দ্বিতীয় সম্পাদক হই আমি। তখন 'নিউজ লেটার' সাইক্লোস্টাইল করে প্রকাশ করা হত। ইয়াসলিকের কর্মসচিব প্রয়াত গোবিন্দভূষণ ঘোষের হাতে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে নিউজ লেটারের পাণ্ডুলিপি অবশ্যই দিয়ে আসতে হত। তখনো আমি 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদক। তখন ইয়াসলিক নিউজ লেটারের সম্পাদক এক বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। আমি কিন্তু পুরো একবছর এর সম্পাদক ছিলাম না। আটটি মাস ঠিক ঠিক গোবিন্দবাবুর হাতে নিউজ লেটারের পাণ্ডুলিপি জমা দেবার পর নবম মাসে ইয়াসলিক থেকে আমি পা ঢাকা দিই। গোবিন্দবাবু অত্যন্ত কষ্ট হন। কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি। ইয়াসলিকে যন্ত্রের মত কাজ করে যেতেন। সুতরাং কার্যনির্বাহক সমিতির মিটিং ডেকে সম্পাদক বদল করা হল। আমার পরবর্তী সম্পাদক হলেন শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

১৯৬৯-৭০ সালে ইয়াসলিকের এক সংকটকাল

চলেছিল। ঐ সময়ই আমি প্রথম ইয়াসলিকের কাউন্সিল সদস্য মনোনীত হই। ঐ সময় থেকেই আমি প্রয়াত শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ইয়াসলিক বুলেটিন মুদ্রণের ব্যাপারে সাহায্য করতে শুরু করি। ১৯৭১ সালে কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে নবম ইয়াসলিক সম্মেলনে আমি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষকের আমার এক সহপাঠী প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র সাহা ইয়াসলিকের সহকারী-কর্মসচিব এবং পরে আমি যুগ্ম কর্মসচিব নির্বাচিত হই। ১৯৭২ সালের সম্মেলনের পর ইয়াসলিক বুলেটিন এর সম্পাদনার ভার পান শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায় এবং ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি এর সম্পাদনা করেন। বলা বাহুল্য, এই পুরো সময়ই আমি তাঁর অলিখিত সহকারী ছিলাম। অজিতবাবুর সঙ্গে প্রায় তিন বছর এবং ফণিবাবুর সঙ্গে পাঁচ বছর কাজ করে এই দুজন মানুষের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে ছিলাম। অজিতবাবু প্রথম প্রথম বুলেটিনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ প্রুফ দেখে দিতেন। পরবর্তী কালে এমন হল যে তিনি প্রুফ দেখার ব্যাপারে আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন এবং নিজের শেষ সম্পাদকীয় ছাড়া কিছুই প্রুফ দেখতেন না। শেষ দিকে তাও ছেড়ে দিলেন আমার জন্য। শেষ দিকে এমন অবস্থা হল যে তিনি কোনরকম সম্পাদনা করা ছাড়াই পাণ্ডুলিপি প্রেসে পাঠাতে শুরু করেন প্রুফ এলে সংশোধন করে দেবেন বলে। কোন কোন লেখায় ঐঁচড় পর্যন্ত থাকত না। সম্ভবত বই লেখা ও ছাপায় ব্যস্ত থাকায় অজিতবাবু এ সময়ে একেবারেই সময় পেতেন না। আমি এজন্য খুবই বিপদে পড়ে যাই। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায়ের সবরকম প্রুফ পুরোই আমি দেখতাম। তবে ফণিদা স্বভাবে ছিলেন অজিতবাবুর একেবারে বিপরীত। পাণ্ডুলিপি কেটেকুটে একেবারে খোল নলচে বদলে দিতেন। তাঁর কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে প্রেসে দেওয়ার অনেক সময় লেগে যেত।

এ রাজ্যের দুই গ্রন্থাগার ব্যক্তিত্ব প্রয়াত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও ফণিভূষণ রায় পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, সর্ব ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও যাঁরা চিন্তায় ও কর্মে নিজেদের বিশিষ্টতার ছাপ রেখেছেন, তাঁদের অতি ঘনিষ্ঠ হয়েও আমার দ্বারা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ কেন হল না তার কারণ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। সম্ভবত আমার উদ্যমের অভাব এজন্য অনেকখানিই দায়ী। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় অথবা 'ইয়াসলিক বুলেটিনে' লেখা ছাপানো আমার পক্ষে একেবারেই কঠিন ছিল না। অন্ততঃ বছরে একটি করে লিখলেও 'গ্রন্থাগার'-এর সঙ্গে প্রায় তিরিশ বছরের সম্পর্কে তিরিশটি এবং ইয়াসলিক বুলেটিনের তার অর্ধেক লেখাও আমি ছাপাতে পারতাম। কিন্তু জীবনে কখনো অনুরুদ্ধ না হয়ে বা বাধ্য না হলে আমি কিছুই লিখিনি। ১৯৭৭ সালে ইয়াসলিকের স্টাডি সার্কল-এর ১০০তম অধিবেশন পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকপত্রে বাধ্য হয়েই কলকাতার মেডিক্যাল লাইব্রেরী গুলি নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি। ঐ বছরেই বৃটিশ কাউন্সিল 'মেডিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিস' সংক্রান্ত একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করলে বৃটিশ কাউন্সিলের তদানীন্তন ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান শ্রীতপন সেনগুপ্তের অনুরোধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। মেডিক্যাল লাইব্রেরীয়ান হিসেবে অন্য একটি প্রবন্ধ লেখেন খ্যাতনামা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী শ্রীইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত। প্রথমে কথা ছিল, আমরা দুজন যুগ্মভাবে একটি প্রবন্ধই তৈরী করব। কিন্তু এটা সম্ভব না হওয়ায় আমরা উভয়ে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ রচনা করে আলোচনা চক্রে তা উপস্থিত করি। এই আলোচনা চক্রে শুধু যে গ্রন্থাগারিকরা যোগ দিয়েছিলেন তা নয়, মেডিক্যাল শিক্ষকের সঙ্গে যুক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, প্রশাসক, গবেষক-ছাত্র প্রভৃতি শ্রেণীর ব্যক্তিরাও এতে যোগ দিয়েছিলেন ও প্রবন্ধ পেশ করেছিলেন। গ্রন্থাগারিক হিসেবে আমাদের আলোচনার বিষয়টি ছিল, 'বিব্লিওগ্রাফিক্যাল ফেসিলিটি ইন মেডিক্যাল লাইব্রেরীজ ইন ইণ্ডিয়া ফর স্টাডি এণ্ড রিসার্চ'। এই আলোচনা চক্রে উপস্থিত আমার কর্মস্থলের তখনকার ওপরওলা অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল আসোসিয়েশনের পত্রিকার সম্পাদক এবং কলিকাতা বিশ্ব

বিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য শ্রীঅজিতানন্দ রায়চৌধুরী* আমাকে জানান যে, আমার প্রবন্ধটি ওঁর ভাল লেগেছে এবং তাঁর পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি তিনি ছাপাবেন। অবশ্য ঐ পত্রিকায় প্রবন্ধটি ছাপাতে প্রায় তিন বছর লেগে যায় এবং ১৯৮০-র জুলাই ১৬ সংখ্যায় এটি শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়। প্রবন্ধটি প্রকাশের পরে 'রিপ্রিন্ট' চেয়ে অনেকেই আমাকে পত্র দেন। কলকাতার আমার পরিচিত দু'একজন চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষক ও প্রবন্ধটি ভাল হয়েছে বলে ছুসেন। অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ-এর অধ্যাপক শ্রী এস সি শীল আমাদের অফিসে কোন কাজোপলক্ষে এসে একথা বলেন আর ওখানকার অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্নেহাংশু চৌধিসোন করে একথা আমাকে জানান। লণ্ডন থেকে 'Leprosy Review' পত্রিকার সম্পাদক এক পত্রে প্রবন্ধটি যে উল্লেখযোগ্য হয়েছে তা জানান। এই সব শিক্ষক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর কাছে প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছিল এই কারণে যে, তাতে ভারতবর্ষের মেডিক্যাল লাইব্রেরীগুলির প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছিল। এ জন্যই সম্ভবত ১৯৭৬ সালে লণ্ডনের মানসেল পাবলিশিং লিঃ প্রকাশিত শ্রীমতী Fiona Mackay Picken এবং Ann Mc Kahn সম্পাদিত Medical Librarianship in eighties and beyond : a world perspective' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে যেখানে বিভিন্ন দেশের মিডিক্যাল লাইব্রেরীগুলি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে তাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে ঐ প্রবন্ধটির।

এরপর ইতিহাসিকে আমার সহকর্মী শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ শতপথীর অনুরোধে আরও দুটি প্রবন্ধ যুগ্মভাবে লিখি। একটি কানপুরে অনুষ্ঠিত ১৯৮২ সালের ইতিহাসিক সম্মেলন উপলক্ষে এবং অপরটি ব্যাঙ্গালোরে স্থিত ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব মেন্টাল হেলথ অ্যাণ্ড নিউরোসায়েন্সেস এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'হেলথ ন্যায়েন্স ইনফরমেশন সার্ভিসেস' সম্পর্কে আলোচনা চক্রে পেশ করার জন্য।

সোজাসুজি 'আপনকথা' লিখতে বসব না বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা সম্ভবত এপর্যন্ত এই আত্ম-প্রচারে ভরে গেল। এটা এমন ঘটা করে লেখার কারণ এই যে, নিখিলে যে নিতান্ত খাটাখাটনি করতাম তা অযথা কত সামান্য লিখেছি এটা বোঝানো। এখানে বোধ হয় স্বীকার করা প্রয়োজন, অগাধের গত শ্রীযুক্ত ফনিভূষণ রায় আমাকে এই সব প্রবন্ধ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন বলেই এগুলি সম্ভবতঃ উৎরে গিয়েছিল।

১৯৭১ সালে পুরুলিয়ায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রজত জয়ন্তী অধিবেশন উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এই স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব আমার ওপরই বর্তায়। যদ্দুর মনে পড়ে তখন আমি আর 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদক নই, 'গ্রন্থাগার' ও প্রকাশন উপসমিতির একজন সদস্য মাত্র। পূর্বেই বলেছি, এ সময়ে আমি ইয়ারলিক বুলেটিন মুদ্রণের দায়িত্বে ছিলাম। বুলেটিন ছাপা হত কলেজস্টোন জোয়ারের কাছে 'মডার্ণ প্রিণ্টার্স' প্রেসে। ঐ স্মারকগ্রন্থটিও আমি ঐ প্রেসে ছাপাতে দিই। রজত জয়ন্তী সম্মেলনের সভাপতি ডঃ হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়ের ভাষণটি ছাড়া পরিষদের পুরোনো মুখের কিছু গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রবন্ধ, চকল কুমার সেন, গীতা মিত্র সভাব্রত সেন, মায়া ভট্টাচার্য প্রভৃতি কয়েকজনের তথ্য-সংকলন এবং লেখক মায়া ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক নীলমেঘনের দুটি ইংরেজী প্রবন্ধ ছিল। মায়া ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটিও অবশ্য ইংরেজীতেই ছিল। স্মারক গ্রন্থের জন্য কয়েকটি লেখা জোগাড় করে দিয়েছিলেন প্রয়াত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একাই অনেকগুলি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন সভাব্রত সেন।

তবে এই স্মারক গ্রন্থের জন্য আকস্মিক ভাবেই একটি লেখা আমি লেখে ফেলি। পরিষদের সোভার যুগের একজন সহ: কর্মসচিব এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষক শ্রীপুলিন কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর

* এই লেখাটি লেখার সময়ে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

কিছুকাল পূর্বেই আমার পরিচয় হয় আমার কর্মস্থলের সহকর্মী প্রয়াত সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীর মাধ্যমে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী তখন আমাদের অফিসের চিকিৎসা-প্রাপ্ত সংক্রান্ত দাবাধশের জন্য প্রকাশিত একটি ইংরেজি মাসিকপত্রের সম্পাদনা করতেন। ইনি এসময়ে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকারও কাজ করতেন এবং সেই সুবাদে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, পরিমল গোস্বামী প্রমুখ তখনকার দিনের অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রয়াত পরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতি চিত্রণ' বইয়ের বেশ কয়েকস্থানে তাঁর নামোল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী আমার অনুরোধে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার জন্য দু'একটি সমালোচনাও লিখেছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক রূপে। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে পরমাত্মীয়ের মত জড়িয়ে ধরেছিলেন। সেকথা তাঁর কাছে উল্লেখ করতেই তিনি আবেগভরে বলে ওঠেন, 'যে পরিবারে কাজে-কর্মে একদিন আমি মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলাম, আপনি সেই পরিবারেরই বর্তমান, যে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটি আজো পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখেছে আপনি তার সম্পাদক। আপনি যদি না আমার পরমাত্মীয় হন তবে আমার পরমাত্মীয় কে?' এরপর তাঁর কাছ থেকে লেখা পেতে আমার আর কোন অসুবিধা হয়নি। তিনি নিজে আমাদের অফিসে এসে আমাকে তাঁর লেখাটি দিয়ে যান।

স্মারকগ্রন্থে এঁর লেখা দেখে শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায় বলে ওঠেন, 'আরে এঁর লেখা কি করে জোগাড় করলেন—ইনি যে আমার মাস্টারমশাই ছিলেন। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায়ও একদা আমার মাস্টারমশাই ছিলেন। আবার আমাদের ছাত্র শ্রীমান শিবাকীনাথ মুখোপাধ্যায় 'গ্রন্থাগার'-এর বর্তমান সম্পাদক হয়েছেন। পরিবারে তো এমনি ধারাই চলেছে। শিক্ষকের পর ছাত্র, কারো গুরু, কারো শেষ।

যেদিন রজত জয়ন্তী সম্মেলনের জন্য রাত্রির ট্রেনে পুরুলিয়া রওনা হব, স্মারকগ্রন্থের শেষ লেখাটির প্রুফ দেখে দিয়ে প্রেস থেকে বেরুতে রাত্রি আটটা হয়ে গেল। তখন আর বাড়ি ফিরে জিনিসপত্র নিয়ে আসার সময় নেই। সোজা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে পুরুলিয়ার গাড়ী ধরি। কথা ছিল প্রেস স্মারক গ্রন্থ পৌঁছে দেবে। কথামত মালও ঠিক ঠিক পৌঁছে দিয়েছিল প্রেস।

পরে স্মারক গ্রন্থটি দেখে আমার চক্ষুস্থির। নীলমেঘনের লেখার অর্ধেক পৃষ্ঠাই নেই। লেখার মধ্যে একটি ভায়াগ্রাম ছিল সেটির ব্লক করতে দেওয়া হয়েছিল প্রেসকেই। 'ইয়াসলিক বুলেটিন'-এর বেলায়ও আমি তাই করতাম। নিউরোমেগা প্রেস বলে একেবারে ছাপার আগে শেষ প্রুফে ব্লকের ছবি নেওয়া হত। দেখা গেল, একপৃষ্ঠা জুড়ে 'লেস সাইজ' ব্লক তৈরী করেছে প্রেস। এরকম আর কখনো হয়নি। আসলে প্রেসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নরেনবাবুর সঙ্গে ইয়াসলিকের কোন কাজ নিয়ে আমার একটু চটাচটি হয়েছিল বলে এইভাবে তিনি আমাকে জব্দ করেন। সম্মেলনের পরে ফিরে গিয়ে স্মারকগ্রন্থের বাকী পাতাগুলিও উদ্ধার করা যায় নি। সম্ভবতঃ সেগুলি বাইণ্ডারের দোকান থেকে বহু আগেই হাওয়া গিয়েছিল। অধ্যাপক নীলমেঘন গণেশ ভট্টাচার্যকে উদ্দেশ্য করেছিলেন, 'তোমার বন্ধুরা আমার প্রবন্ধের অর্ধাংশ স্মারক গ্রন্থেছেপেছে বাকী অর্ধাংশ কোথায় ছাপবে জিজ্ঞাসা কোর তো?'

রজত জয়ন্তী সম্মেলনে সেবারে পুরুলিয়ায় ক'দিন আমাকে শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায়ের ঢোলা পাঞ্জাবী ও পায়জামা পরেই কাটাতে হয়েছিল। আর এই বৎসরেই সম্মেলনের দিনগুলির কোন একদিন তখনীন্তন 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক এবং সহঃ সম্পাদিকার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটার সূত্র ধরে তাঁরা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। ঘটনাটি আসলে একটি দুর্ঘটনা, যার ফলে 'গ্রন্থাগার'-এর সহঃ সম্পাদিকা গুরুতর আহতও হয়েছিলেন। তবে এর পরিণাম শুভই হয়েছিল। নিজেকে ঐ ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মনে করে অনুতপ্ত সম্পাদক হয়তো তার ভুলের খেসারত হিসেবেই এরকম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এরকম কত ঘটনাই

না সে সময় ঘটেছিল।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে আমাদের সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলি কবেই চলে গেছে! তবে সেই পরিষদ আজও আছে। আমি এখনও নামে তার সঙ্গে যুক্ত। আজ যেসব তরুণ-তরুণী পরিষদে কাজকর্ম করছেন তাঁদের জীবনেও হয়তো এরকম বা এর চাইতেও নানা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটছে। পরিষদে সে সময়ে যেসব দায়িত্বভার পেতাম তা সাধ্যমত নির্বাহ করার চেষ্টা করেছি। কতখানি সফল হয়েছি সে বিচারের ভার আমার ওপর নেই। সে সময়ে সর্বশ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু, অনাথবন্ধু দত্ত, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ রায়, বাণীরঞ্জন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু গ্রামাণিক প্রমুখ পরিষদের বয়োজ্যেষ্ঠদের অকৃপণ স্নেহ পেয়েছিলাম; তেমনি পেয়েছিলাম বন্ধু ও অনুজদের অফুরন্ত ভালোবাসা। আমি অনেক সময়েই ভাবি, এত স্নেহ ও ভালবাসার আমি কি পাত্রাপাত্র যোগ্য ছিলাম? হয়তো আমার এটা ভুল; স্নেহ ও ভালোবাসা বোধ হয় যোগ্য ও অযোগ্য, বিচার করে না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলিই কেটে গেছে দুই গ্রন্থাগার পরিষদের কাজে। হয়তো বলার মত কিছু কাজ করিনি, হয়তো বলার মত কিছু আমার নেইও, তবে আমার জীবনের যা কিছু প্রাপ্তি তা পরিষদের সুবাদেই, এ কথা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

'গ্রন্থাগার' প্রসঙ্গে এই 'আপন কথা' দীর্ঘ হয়ে গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক অবান্তর কথা হয়তো এতে ঢুকে গেল। কথা যে ফুরোতে চায় না! কিন্তু শুনবে কে? আজকের দিনের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানী তরুণ-তরুণীদের কি বিগত যুগের এই সব কথা শুনতে ভাল লাগবে? বার্ধক্যের দিকে পা বাড়িয়েছি, বার্ধক্যের প্রগল্ভতাই হয়তো আমাকে পেয়ে বসেছে। অথবা অনেক দিন পরে অতুলানন্দ শর্মাই পুনরায় আমার স্কন্ধে ভর করেছেন।

তবে আমার দাবী এটা 'স্মৃতিকথা'ও নয়। স্মৃতিকথা লিখলে তো অনেক কথাই লেখা যেতো। 'গ্রন্থাগার' প্রসঙ্গেই আমি এই লেখা সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছি এবং এই প্রসঙ্গেই ঐ সময়ের লেখালেখি ও প্রকাশন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রসঙ্গ এসেছে। উল্লেখ করতে ভুলে গেছি, ঐ সময়ে আমার কর্মস্থলের দুটি পত্রিকায় আমার কাজের অঙ্গ হিসেবেই কিছু কিছু পুস্তক সমালোচনা এবং অন্য ধরণের দু'একটি লেখা লিখেছি, নাম দিয়ে বা নাম ছাড়াই। ইয়াসলিক বুলেটিনে'ও আমার এ ধরণের লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

লেখাটি যথাযথ এবং তথ্য নির্ভর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবু হয়তো অনেক ত্রুটি রয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে অজিতবাবু এবং ফণিদা সম্পর্কে আমি যা লিখেছি সম্প্রতি পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে সৌভাগ্যক্রমে তার সপক্ষে দুটি চিঠি পেয়ে গেলাম। সে সময়ে এ ধরণের চিঠিপত্র অজিতবাবু আমাকে প্রায়ই পাঠাতেন এবং ফণিদাও তাঁকে যোগ এরকম পত্র আমাকে লিখতেন।

(১)

8/55 Fern Road Cal-19
9/9/.0

My dear Nirmal,

Packet No (1) Contains corrected page make up proofs, pkt. (2) Cover, Advt, etc. and pkt (3) the Mss.

Please check up pkt (2) and arrange the advertisements. The proof of Table of contents, for V. 13 must also be corrected.

Ask MIP to submit **final page proof**, including covers, contents, advts, etc., by **Friday**, so that printing order may be given on Saturday or Monday next.

Ascertain also the quantity of paper of its specification and arrange for its purchase immediately.

Meet me on Saturday at home.

yours etc.

a. k. m

'MIP' হচ্ছে মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস যেখানে ইয়ানলিক বুলেটিন তখন ছাপা হত। সে সময়ে বুলেটিন ছাপার ব্যাপারে অজিতবাবুর বাড়ীতে আমাকে প্রায়ই সপ্তাহে একদিন বা দুদিন যেতে হত। প্রথমে তাঁর পার্ক রোডের বাসায় এবং পরে একডালিয়া প্লেসের ফ্ল্যাটে। অজিতবাবু তো বটেই, মাদিমা অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকেও পুরস্কার স্নেহ পেয়েছি।

(২)

Ref. No. 34 (Bull) 72 Dated 26 August 1972

স্নেহাস্পদেষু,

আপনার পাঠানো প্রুফটি পেয়েছি এবং দেখেছি কিন্তু প্রেসে দিই নি। কারণগুলি নীচে দিলাম :—

১। শ্রীকুমার এর লেখাটি Colon Classification-এর একটি tentative schedule-এর উপর ভিত্তি করে লেখা; যে জার্নাল সাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয়নি তা সে যে কারণেই হোক তার সম্বন্ধে এই ভাবে মতামত প্রকাশ করা সমীচীন নয়।

২। আমি এর এক কপি tentative schedule (up to date) সংগ্রহ করেছি। তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কাজেই একটি পরিবর্তনশীল জিনিসকে নিয়ে মন্তব্য করা বোধ হয় ঠিক হবে না। এবার বিশেষ করে এইজন্য বলছি যে ঐ জিনিসটি এখনও সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয়নি।

৩। আমার মনে হয় এটি প্রকাশ করার আগে ওর এক কপি DRTC-কে পাঠিয়ে দেওয়া ভালো। কিম্বা শ্রীকুমারকে DRTC-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা ভালো।

আপনি এলে আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। আশা করি ভালো আছেন। মেহাশীষ জানবেন। ইতি ফণিদা।

পত্রটি পাঠানো হয়েছিল ৩/৫ মধুসূদন বানার্জী রোড, ফ্ল্যাট এ, কলিকাতা-৫৬, বেলঘরিয়ায় আমার ঠিকানায়।

ইয়ানলিক বুলেটিনে লেখা ছাপার ব্যাপারে অজিতবাবু ছিলেন যেমন বেপরোয়া, ফণিদা ছিলেন তেমনি দ্বিধাগ্রস্ত। লেখার পাণ্ডুলিপি হাতে পেলে অজিতবাবু 'Publish or Perish' নীতি অবলম্বন করতেন। ফণিদা চাইতেন ঘসেমেজে লেখাটিকে উৎরে দেওয়া যায় কিনা। প্রুফ আসার পর লেখার ম্যাটার ধরে রাখা বা লেখাটি আর না ছাপানো এরকম ঘটনা আরও কয়েকবার তখন ঘটেছিল, লেখাটি বিতর্কমূলক বা ছাপার জন্য যথেষ্টপরিমাণ বক্তব্যবিষয়ের অনুমতি পাওয়া যায়নি বা অন্য কোন কারণে।

পূর্বেই বলেছি, 'আপন কথা' নাম দিলেও এই লেখাটি আমার নিজের কথাই কেবল নয়। পরিষদের পত্রিকায় লেখবার মত সেরকম কিছু 'আপন কথা' আমার নেই এবং থাকলেও সেটা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় সে সম্বন্ধেও আমি সম্পূর্ণ সচেতন। তবে দুই গ্রন্থাগারিকের একটি ছোটখাটো আমাদের কালের কিছু কথা, সমসাময়িকদের কথা অবশ্যই কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে। সেটা নির্ভর করে লেখাটি কতটা বস্তুনিষ্ঠ এবং বিশ্লেষণাত্মক হয় তার ওপর।

বর্তমানে পরিষদে আর্থিক সংকটের জন্য যেকের ব্যয়-সংকোচের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তাতে এই জাতীয় দীর্ঘ লেখা আর ছাপা সম্ভব হবে কিনা জানি না। তবে বারান্তরে 'আমাদের পরিষদের দিনগুলি' সম্বন্ধে একটি লেখা দেবার ইচ্ছে রইল।

Annual Subscription : Rs. 18.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 42 : No. 1 April—May, 1992

Contents

PAGE

New Year's Eve (Editorial) 1
Asitabha Das

A Librarian looks back (2nd Part) 3
Nirmalendu Mukhopadhyaya
"Granthagar"

A reminiscecnes (2nd Part)

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 44-6866 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor : Pinakinath Mukhopadhyay

ISSN 0017-3246

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪২, সংখ্যা ৭ | সম্পাদক : শিলাজিৎ মুখোপাধ্যায় | ১৩৯৯, কার্তিক

সূচী

	পৃষ্ঠা
সাক্ষরতা আন্দোলন (সম্পাদকীয়)	129
১৮ই ডিসেম্বর	130
ডঃ অনিল চন্দ্র পাল	
গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও ...	131
অশোক মুখোপাধ্যায়	
বাংলা জিসবাস সংকলন প্রসঙ্গে	136
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা	148
শ্যামল কুমার পাল	
ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন (১৮৯২-১	149
শোক সংবাদ	151
English Abstracts	152

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪২, সংখ্যা ৭ | সম্পাদক : পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায় | কার্তিক, ১৩৯৯

॥ সম্পাদকীয় ॥

॥ সাক্ষরতা আন্দোলন ॥

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন দেশের মানুষ ঘরে ঘরে শিক্ষার আলোকের যে স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বপ্ন আজও অলীক, অশিক্ষার অন্ধকারেই ডুবে থাকল দেশের বৃহদাংশ মানুষের জীবন। সাক্ষরতা আন্দোলনের জনক ও উনিশ শতকের বাংলার নব জাগরণের শ্রেষ্ঠ নায়ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ সালে স্ব-রচিত বর্ণ-পরিচয়ের মাধ্যমে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার যে আলো জ্বালিয়েছিলেন, সেই আলোর মর্যাদা না দিয়ে ধনিক শিক্ষা স্বার্থ সংরক্ষণে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল স্বাধীন ভারতবর্ষ সরকার। ফলস্বরূপ ৪৫ কোটিরও বেশী নিরক্ষর মানুষ আজও বাস করে ভারতবর্ষে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকারের ধারাতে বিশ্বের প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার স্বীকৃতি পেলেও বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম দেশ ভারতবর্ষে নিরক্ষর ব্যক্তির বসবাস সবচেয়ে বেশী, এটা নির্মম সত্য। যদিও ভারতবর্ষের সংবিধানে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার সার্বজনীন শিক্ষার কথা উল্লেখ করা আছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেটা পালন করার বিন্দুমাত্র উৎসাহ ও উদ্যোগ দেখাননি। ১৯৪৮ সালে গঠিত থের কমিটির সুপারিশ শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ বা ১৯৬৬ সালে কোঠারী কমিশনের সুপারিশ জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ আজও মানুষের কাছে স্বপ্ন রয়ে গেল।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯২-৯৩ সালের বাজেটে ধনী পরিবারের সন্তানের জন্য আয়োজিত ও সুরক্ষিত নবোদয় বিদ্যালয়গুলির সাড়ম্বর সজ্জার আয়োজনে ১১৫ কোটি টাকা ধার্য করতে ভোলেননি। যদিও অধ্যক্ষ রামমূর্তির নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিত নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধেই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

এত বিরুদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও আমরা জানি মানুষের সংগঠিত শক্তি ও গণ উদ্যোগ এক বিরাট সফলতা এনে দেয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে তাই সর্বপ্রথম কেরালার এর্নাকুলাম জেলা গণ উদ্যোগ সফলতা লাভ করে—পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র কেরালা রাজ্য সাক্ষর রাজ্য হিসেবে সফল হয়। পশ্চিমবঙ্গেও সংগঠিত সাক্ষরতা আন্দোলন গণতান্ত্রিক চেতনা ও গণউদ্যোগে যুক্ত হয়ে বর্ধমান, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা সাক্ষর হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিদেরও নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথোচিত ভূমিকা পালন করে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে সাক্ষরোত্তর প্রকল্পে যুক্ত হবার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বান

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

বন্ধুগণ,

২০শে ডিসেম্বর দিবসটি সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯২৫ সালে এই দিনটিতে অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ঐতিহাসিক দিনটি প্রতি বৎসর 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি হলেও গ্রন্থাগার পরিষেবা সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা এখনও গ্রহণ করতে পারেনি। গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগারগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে পক্ষকাল ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী যথা জনসভা, আলোচনা চক্র, পদযাত্রা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রচার করার জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীর প্রতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আহ্বান জানাচ্ছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষে এক অস্বস্তিকর জাতীয় পরিস্থিতির মধ্যে এবারের গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হতে চলেছে। এক অবর্ণনীয় আর্থিক সংকট কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে গ্রাস করেছে। এই নিদারুণ আর্থিক সংকটের ফলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারাও বিপর্যস্ত হচ্ছে। অপরদিকে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদের অভ্যুত্থানসহ হিংসাশ্রয়ী ঘটনার আবর্তে জনমন বিক্ষিপ্ত। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা তথা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন। দেশ অস্থির হলে শিক্ষাক্ষেত্রও গ্রন্থাগার সুস্থির থাকতে পারে না। তাই পরিষদ গ্রন্থাগারকর্মী ও দরদীদের গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মানুষকে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও রূপমণ্ডকতার বিরুদ্ধে সচেতন করার প্রয়াসে সামিল হতেও আহ্বান জানাচ্ছে।

এই বৎসর প্রাক্তন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের ও প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম শতবর্ষ। তাই তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শপথ নিতে হবে উচ্চমানের গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রবর্তন ও নিরক্ষরতা মুক্ত সমাজ গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করার। বিগত কয়েক বছর ধরে রাজ্যব্যাপী যে সাক্ষরতা আন্দোলন চলছে তার ফলে পাঁচটি জেলা পূর্ণ সাক্ষর ঘোষিত হয়েছে। এই সদ্য সাক্ষর মানুষদের গ্রন্থাগারে নিয়ে আসার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের। গ্রন্থাগারগুলি যাতে সাক্ষরতা পরবর্তী কর্মক্রম যথাযথভাবে অংশ গ্রহণ করে তার জন্য উপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি পরিষদ আহ্বান জানাচ্ছে।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৯২ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে

কেন্দ্রীয় জনসভা

স্থান : ভারত সভা হল : বৌবাজার স্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউএর সংযোগ স্থল

সময় : বিকাল—৬টা ❖ দলে দলে যোগ দিন ❖

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পাঠাভ্যাস

ডঃ অনিলচন্দ্র পাল

০ বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন এবং প্রয়োগ কর্ম তার বিস্তৃতি ঘটায়, মানবজীবনের এবং সামগ্রিকভাবে সমাজজীবনে তার অনন্ত প্রভাব পড়েছে। তার প্রভাব থেকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিষেবাও বাদ পড়েনি। বিজ্ঞানের সমৃদ্ধতির ফলে উদ্ভূত হয়েছে তথ্য ব্যবস্থা, তথ্য তথ্য পরিপ্রেক্ষণ ও বিতরণের আধুনিক পদ্ধতির সাংগঠনিক ব্যবস্থা। মানুষ তার জীবিকার্জন এবং প্রয়োজনের ভিত্তিকে অবলম্বন করেই গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের দ্বারস্থ হয়। আর প্রকৃতপক্ষে মানুষ আছেন, যাঁদের মানসিক গঠন এমনই যে তাঁদের বৌদ্ধিক ক্রিয়াকর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে, তাঁদের গ্রন্থাগারমুখি হতেই হয়।

০১ প্রাচীন ভারতীয় জীবনধারনার রীতিতে স্বাধ্যায়ের স্থান ছিল অতি উচ্চে। প্রাত্যাহিক পরিধর্মে স্বাধ্যায়ের ব্যবস্থাও ছিল। স্বাধ্যায় হল নিত্য বেদাধ্যয়ন। বেদ হল জানা বা জ্ঞান। চিন্তা জগতের সামগ্রিক পুস্তকাগারে টি ছিল বেদের পরিসীমার অন্তর্গত। সমাজ ব্যবস্থায় পুরোহিততন্ত্র শক্তিধর হয়ে পড়ার পরবর্তী পর্যায়ে তা হয়তো বা ধর্মীয় আধারে স্থাপিত হয়েছিল। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ চিরন্তন তথ্যগুলি সামগ্রিক জীবনযাত্রার প্রতিফলিত করার মহান উদ্দেশ্যেই গ্রথিত তথ্য নিত্যপাঠের পরিসীমার মধ্যে নীত হয়েছিল। বলা হতো শব্দার্থ ও বাচ্যার্থের অর্থবোধ না করে পাঠ করলে উদ্দেশ্য হবে নিষ্ফল। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও চিন্তাধারার নবদিগন্ত উন্মোচিত হওয়ায় মানবকুল পূর্বে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে আর্থ-সামাজিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রচলিত সাংস্কৃতিক রীতি, রাজনৈতিক সচেতনা বৃদ্ধি, শিক্ষার অর্থের আচ্ছন্ন তথ্যবস্থা এবং চিরন্তন জ্ঞানবোধপূর্ক আংক বস্তুর অভাবে, গ্রন্থাগারের প্রতি—চিন্তাহীন ব্যক্তি ক্রমনির্তদীন হয়ে ওঠেন।

০১১ উন্নয়নশীল জাতির মধ্যে যেখানে শিক্ষার বিস্তার সীমিত, সেখানে উচ্চ শিক্ষার হার ও নিম্নমুখী। তাই শতকরা জনসংখ্যা যেখানে উচ্চশিক্ষিত সংখ্যার নীচে; সেখানে গ্রন্থাগারের উপর নির্ভরতা কমেই অধ্যয়নের পরিকাঠামোটি গড়ে ওঠে। কারণ সমর্থ আহরণের বা গ্রহণের জন্য অধ্যয়ন, পরিতৃপ্তির গ্রহণের জন্য নানান কোষ, বা গ্রন্থ, মহাকোষ, ব্যক্তিগত সকলতার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। যার গ্রন্থাচ্ছাদনের সংস্থান নেই তার পক্ষে প্রয়োজন ব্যতিরেকে নিছক আনন্দ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ গায়ে যথেষ্ট আনাটা নিতান্তই বিলাসিতার নামান্তর হয়ে ওঠে। তাই প্রয়োজনের ভিত্তিতেই গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে :

০১২ যাঁরা আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সমাজ-রাজনীতি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন ও সরবরাহী। এ-সব ব্যবহারকারীরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন, আবার নিজস্ব সংগ্রহের বৃদ্ধি এবং তার যথাযথ সদ্ব্যবহারও করে থাকেন।

০১২১ দ্বিতীয় স্তরের ব্যবহারকারীদের মধ্যে ছাত্র, অধ্যাপক ও গবেষকই প্রধান। কাগজের অপকৃতত্ত্ব, ছাপার ব্যয় বৃদ্ধি, প্রচার ও বিপণীর অভাবে অনেক পুস্তকই যথাযথ ভাবে ব্যবহারকারীদের হাতে এসে পৌঁছায় না। ক্রয় ব্যয় দাবা এবং গ্রন্থাগার পরিচালক ও পুস্তক প্রকাশকদের মধ্যে যৌথ তৃষ্ণবোধ ও সহযোগিতার অভাব, এই সব ব্যবহারকারীদের গ্রন্থাগার ও পাঠবিমুখ করে তোলে।

০১২১১ তৃতীয় পর্যায়ের পাঠক বা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিম্ন সাক্ষরতা, জীবিকার্থে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহকারীই প্রধান যাঁরা সুযোগের অভাবে প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণে অসমর্থ হয়েছেন তাঁরা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

০১৩ অধ্যয়নের আগ্রহ বৃদ্ধির প্রয়োজনে অস্তিত্ব রক্ষার্থে যেমন সহযোগিতার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পাঠ্যাভ্যাসকারীর হাতে স্বল্প মূল্যের পুস্তকরাজি তুলে দেওয়া। কারণ জাতি-গঠনের জন্য এই ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন।

০১৩১ বর্তমানের ভারতীয় প্রকাশকেরা সবাই মিলে লাভজনক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থায় আগ্রহী।

০১৪ শিশুরা অত্যন্ত সহজ উপায়ে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার বিষয়ীভূত তথ্যের হৃদয়ঙ্গম করতে পারে গ্রন্থাগার পরিচালক গণসংযোগের মাধ্যমে। শিশু বা সদ্য অক্ষর জ্ঞান-প্রাপ্তদের অতি সহজেই সাম্প্রদায়িক বিরোধী চিন্তা, জাতিভেদের কুফল, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, উগ্রবাদীর সংহতি বিরোধী চিন্তার কুফল সম্পর্কে অবহিত করার সুযোগ পান। অবশ্য সংগ্রহ ও পুস্তক নির্বাচন সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। পুস্তক প্রকাশকগণ গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবহারকারীদের ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার জন্যই পুস্তক প্রকাশের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করলে ভালো ফল পেতে পারেন। যি চিল্ড্রেন্স বুক ট্রাস্ট এবং ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট বিশিষ্ট পর্যায়ের পুস্তক প্রকাশক এই স্তরে পড়েন। এই দুটি প্রকাশক সংস্থাকে সস্তার কাগজ সরবরাহ ছাড়াও অন্যান্য ব্যাপারেও সহায়তা করা প্রয়োজন। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী অফ্ ইণ্ডিয়া (১৯৭২) এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করতে পারেন।

০১৫ ভারত সরকার ১৯৬৭ সালে জাতীয় পুস্তক উন্নয়ন সংস্থা (National Book Development Board) স্থাপন করলেও তা ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। এই সংস্থার নামের পরিবর্তন ঘটেছে, এখন ক্রিয়াশীল সংস্থাটির নতুন নাম হয়েছে জাতীয় পুস্তক উন্নয়ন সভা (National Book Development Council)। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সংস্থা কয়েকটি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

১. ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত শিক্ষাভিত্তিক সর্বস্তরে গুণগত উপকর্ষতা নির্ধারণ করা।

২. পুস্তক পরিগ্রহণের সর্বসুযোগের ব্যবস্থা সংস্থাপন করা।

৩. পঠন পাঠনের সুযোগ বৃদ্ধি সহ শিশুদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।

৪. প্রকাশনার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় এবং অনুমোদিত সর্বভারতীয় ভাষায় আদর্শ প্রকাশন ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ করা।

৫. পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে সর্ববাধা দূরীকরণ এবং দেশীয় লেখকদের সুবিধাদান সহ উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা, বিতরণ ব্যবস্থা ও বিপণনের ব্যবস্থা।

৬. পাঠ্যাভ্যাসের সুযোগ দান ও পাঠ্যাভ্যাসের কৌশল নির্ধারণ।

৭. শিশু সাহিত্যের এবং সাবিক সাহিত্যের সমুন্নতি সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ। নিরক্ষরতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গ্রামীণ পরিবেশে কার্যপদ্ধতি চালনা করা।

৮. শিক্ষাসম্পর্কীয় [প্রকাশন] আলোচনা চক্র, প্রয়োগিক কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাদান করা প্রয়োজন।

৯. সর্ব ভারতীয় ভাষার লেখকদের উৎসাহ দান।

১০. লেখকদের সর্বস্বত্ব সংরক্ষণ করা।

১১. বিজ্ঞান ও গবেষণামূলক পুস্তক ও উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত যে বিষয়ীভূত নীরনামার মাতৃভাষায় প্রকাশনার ব্যবস্থাপনার উৎসাহদান।

১২. গবেষণা, পঠন পাঠন, পরিকল্পনামূলক সাংগঠনিক উন্নয়ন। এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হ'লে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও সমষ্টিগত পর্যায়ে পাঠাভ্যাসের স্পৃহা বৃদ্ধি ঘটবে এরূপ আশা করা নিরর্থক নয়।

০২ পাঠ্য বিষয় ও প্রকাশক সংস্থা :

১. পাঠক ও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের স্বার্থে প্রকাশকদের পাঠ-সমীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। পুস্তক মেলা ও গ্রন্থাগারসমূহ এবিষয়ে তাঁদের সাহায্য করতে পারেন।

২. সমাজ পটভূমিকার পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে পুস্তক প্রকাশনের প্রয়োজন।

৩. প্রকাশকেরা লেখকদের চিন্তামূল্যকে উৎসাহিত করবেন।

৪. পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্য ছাপা, বাঁধাই সব সময়ই উচ্চমানের হওয়া উচিত।

৫. আন্তর্জাতিক মানের চিত্তাকর্ষক রচনাকর্মে প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে চিরজীবী করার প্রয়োজন।

৬. পাঠ্যাভ্যাস প্রভৃতি পর্বে শিশু সাহিত্যের উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

৭. প্রকাশিত পুস্তকের মূল্যমান অবশ্যই ব্যবহারকারীদের গ্রাহকের মধ্যে রাখা প্রয়োজন।

৮. সরকার প্রকাশন সংস্থাকে তার সততার মূল্য প্রদানের জন্য অর্থ ও সম্মান দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

৯. বিক্রয়যোগ্য পুস্তকরাজির ব্যবসায়িক তালিকা প্রস্তুত করবেন—সমস্ত পুস্তক প্রকাশকেরা সার্বিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে।

০২১ পুস্তক বিক্রেতা ও পুস্তক পরিবেশক দায়িত্ব ও পাঠাভ্যাসের পরিবেশ গঠন :

সাধারণত গ্রন্থাগারের সংগঠনমূলক ভিত্তির উপরই পাঠ্যভ্যাস গড়ে ওঠে। ব্যবহারকারীদের ইচ্ছা এবং গ্রন্থাগারের সংগৃহীত ভাণ্ডারজাত বস্তুর যথাযথ সংবরাহের মাধ্যমেই সার্থক হয় গঠন প্রক্রিয়া। তাই গ্রন্থাগারের পাঠ্যবস্তুর সংগ্রহমূলক পরিকল্পনাটি বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া উচিত। এ-সম্পর্কে এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটা কথা বলার প্রয়োজন যে অর্থসামর্থের সীমাবদ্ধতা যেমন সংগ্রহের কাজকে ব্যাহত করে; ঠিক তেমনি ক্রয়সামর্থ থাকলেও সব সময় যথাযথভাবে পাঠ্যবস্তুর সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না।

পুস্তক পরিবেশকদেরও পুস্তক পরিবেশনের সামর্থের সীমাবদ্ধতা বর্তমান। পুস্তকরাজি নিজস্ব প্রয়োজনেই ক্রয় করে থাকেন গ্রন্থাগার পরিচালকেরা। কিন্তু ক্রীত পুস্তকের দাম দিতে যে প্রক্রিয়াটি সচল, সেটি অচলতারই নামান্তর। তাই পুস্তক পরিবেশক শ্রেণী যুক্তি নিয়ে দেশের অন্যান্যদের এ বিপণনের উদ্দেশ্যে পরিবেশকের কর্মে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন।

০২২ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারে ব্যবহার কারীদের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত যেকোন শিরোনামার (topic) ব্যবহারকারীর গঠনের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত গ্রন্থবস্তুর সমীক্ষা করলে জানা যাবে যে গ্রন্থপঞ্জিসমূহ থেকে যথাযথ ভাবে নির্বাচিত পুস্তকও ক্রয়ের ক্ষেত্রে অলভ্য হয়ে উঠে। তাই ইচ্ছা থাকলেও ব্যবহারকারীদের উপযুক্ত পুস্তক পরিষেবায় নিয়োজিত করা সম্ভপর হয়ে উঠে না।

ব্যবহারকারীর ভিন্ন রুচি ও ভাবনা সম্ভাত বিষয়ের উপরও পুস্তক/পত্র পত্রিকা সংবরাহ করা সব সময় সম্ভব হয় না; কখনো বা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হয়। পুস্তক পরিবেশকরা কখনো বা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হয়। পুস্তক পরিবেশকরা এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গ্রন্থ প্রকাশককে তা অবহিত করতে পারেন। তাই গ্রন্থাগারিক ও পুস্তক পরিবেশকের মধ্যে 'বহুস্তর-ভিত্তায়' একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত। পাঠ্যভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারিকের উচিত ব্যবহারকারীদের অভিরুচির সমীক্ষা গ্রহণ করা। এবং জাতীয় স্বার্থে যে তথ্যগুলি প্রকাশকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। তাঁরা ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করেই পাঠকের পাঠপুহা পূরণের তাতেই সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন।

০২২১ তাই পুস্তক পরিবেশক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন প্রকাশক বিশেষতঃ Basil Backwell, Heffers, Dibons ব্যবহারকারীদের অভিরুচি পরিপূরক সংস্থা।

০২৩ শিশুশিক্ষা ও পাঠাভ্যাস :

শিশুকাল থেকেই আদর্শগত ভাবে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার সুযোগ থাকা উচিত। সব মায়েরাই বহুনা প্রবধ চকমকানো শিশুদের অন্তমুখী করে তোলার জন্য গল্প

শুনিয়ে থাকেন। বীরগাথা, ভূতের গল্প, মহাপুরুষদের জীবনী থেকে কাহিনী, কল্পনাপ্রবণ বিজ্ঞান অভিযানের কাহিনীও গল্পচ্ছলে বলা হয়ে থাকে। বস্তু হওয়ার মুখে এ-সব কাহিনী পুস্তকাধারে শিশুদের কাছে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন। কল্পনাপ্রবণ শিশু কল্পনা ত্যাগ করে তাহলে জাতিগঠনের কাজে এবং দেশসেবার কাজে আদর্শগত ভাবেই তৈরী হতে পারে। জীবন গঠনের প্রাথমিক পর্ব থেকে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা শিশুতত্ত্ববিদরা স্বীকার করেছেন।

০২৪ নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে পাঠাভ্যাস সংগঠনের ভূমিকা :

এশিকুলায় ও স্কোত্তায় শহরে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য পাঠাভ্যাস গঠন করার স্বার্থে কয়েকটি সংস্থা সংগঠিত হয়েছে। স্বল্প-বয়স্কদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সংস্থাগুলি উৎসাহিত করে থাকেন।

জয়াকর স্মৃতি পুস্তকার সভা পাঠাভ্যাস সংগঠনের উদ্দেশ্যে যুব সমাজ, শিশুপাঠক এবং অনগ্রসর সমাজভুক্ত মানুষের মধ্যে, মহিলাদের মধ্যে পুস্তক বিতরণ করে থাকেন। কেরলার কেরলা গ্রন্থশালা সঙ্ঘ নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও পাঠাভ্যাস অব্যাহত রাখার জন্য সদ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রথাগত শিক্ষা সমাপ্তকারীদের মধ্যে যোগ্য গ্রন্থ বিতরণ করে থাকেন। পত্র/পত্রিকার ব্যবহারেও উৎসাহিত করে থাকেন। ১০%সরকারী সাহায্য পুস্তক ক্রয় খাতে ব্যয়িত হয়।

০২৫ পুস্তক বিক্রেতা ও পুস্তক পরিবেশকদের পাঠাভ্যাস গঠনের দায়িত্ব :

১, বিতরণ/ক্রয়।

২. সাধারণ পাঠকের আগ্রহ সমীক্ষা।

গ্রন্থাগারের কর্মরত গ্রন্থপরিবেশকেরাও তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক ব্যবহারে পরিতৃপ্ত করে থাকেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথনের পরিষেবার পঞ্চসূত্রটি অনুক্ষণ মনে রেখেই তাঁদের পরিষেবার পরিতৃপ্ত করা হয়। কিন্তু তাঁদের পাঠ তাদের রীতি সব সময় বিজ্ঞানভিত্তিক না হওয়ায় প্রচুর সময়ের অপচয় হয়ে থাকে।

প্রকাশনের মাধ্যমে পাঠপুষ্টার পরিবেশ গড়ে তোলেন প্রকাশকেরা। সহযোগিতা মনোভাব, আন্তঃ গ্রন্থাগারিক সেনদেনের মধ্য দিয়েই ব্যবহারকারীদের পাঠপুষ্টা গড়ে ওঠে সে কথাটি পরিবেশক কর্মীদের মনে রাখা উচিত। তাই গ্রন্থাগারে অপ্রত্য পুস্তকের ক্ষেত্রে গ্রন্থ ঋণ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষাবিস্তার এবং সাধারণ ব্যবহারকারীদের পাঠপুষ্টা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সরকারের সহযোগিতা ও অনুদানের প্রয়োজন। প্রয়োজনে বিধি নিয়মের পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রশাসনকে অবহিত করার প্রয়োজন। পাঠপুষ্টা বিবর্ধনের জন্য গ্রন্থমেলার ভূমিকা অনন্ত। পাঠক তার রুচি অনুযায়ী পাঠপুস্তক মেলা থেকে ক্রয় করার সুযোগ ও স্বাধীনতা দুই-ই পান।

০১ গবেষকদের পাঠপুষ্টা বৃদ্ধি :

গবেষকরা নিজের প্রয়োজনেই অধ্যয়নের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলেন।

ভারতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথনের অন্যতম শিষ্য ডঃ জি ভট্টাচার্য স্বাধ্যায় (Self Study) সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পথ অবলম্বনের উপায় উদ্ভাবন করেছেন :

১. অতীত বিষয়বস্তুর সংগৃহীত তথ্যগুলি যতদূর সম্ভব ব্যবহারোপযোগী ও বাস্তব সম্মত হওয়ার প্রয়োজন।

২. তথ্যবস্তুর শিরোনামাগুলি প্রচলিত বিষয় বিভাজনের রীতিতে সংগৃহীত ও প্রণালীবদ্ধ করা উচিত।

৩. সূচিকরণ পদ্ধতির (Indexing) ব্যবহার সাময়িক অধীতব্য তথ্য বস্তুর উপর প্রয়োগ করা উচিত—আধুনিক সূচিকরণের নিয়ম ও রীতি সময় অপচয় রক্ষার স্বার্থে এবং প্রয়োজনের সাপেক্ষে।

৮. ব্যক্তিগত স্বাধ্যায়ের পরিণতিতা পরিমাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য আলোচনামূলক সভা সমিতিতে যোগদান করাও বিশেষ প্রয়োজন। গবেষকগণ এ-সম্পর্কে তাঁদের নির্দেশকের দ্বারস্থ হবেন।

০৪ স্বাধ্যায় কেন্দ্র :

সম্প্রতি কলকাতায় একটি স্বাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। থিয়োজোফিক্যাল সোসাইটীর শ্রীমতী রাধা বারণিয়ে-এর উদ্যোগে এই পাঠকেন্দ্রটি উদ্বোধিত হয়েছে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি [১৯৯১]।

শ্রীমতী বারণিয়ে হলেন সোসাইটির সভাপতি। ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের পুস্তক, পত্রাদিসহ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজির পঠন পাঠনের সর্বাধুনিক ব্যবস্থা সেখানে বিদ্যমান। স্বাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারণ [illegible]।

নিবন্ধ রচনায় রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্মী শ্রীঅনুভূষণ বিশ্বাস কিছু সবুজ সাহিত্য [Grey Literature] দিয়ে সহায়তা করেছেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বাংলা থিসরাস সংকলন প্রসঙ্গে

• শচীন্দ্রী মারক বক্তৃতায় পঠিত প্রবন্ধ

অলোক মুখোপাধ্যায়

থিসরাসকে বলা চলে সাধারণ অভিধানের উলটো। শব্দের অর্থ বা মানে জানার জন্য লাগে অভিধান। এ ছাড়াও স্বীকৃত বানান বুৎপত্তি কিংবা শব্দ বিষয়ে আরও অনেক খবর পাওয়া যায় অভিধানে। এ জাতীয় বই এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে—বেশী ব্যাখ্যা অপ্রয়োজন।

ইংরেজি ভাষার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক বেশি, চর্চাও করেন নিয়মিত পিটার মার্ক রোজের থিসরাসের কথা তাঁদের অজানা নয়। ১৮৫২ সালে রোজের থিসরাস বার হয়। বাংলায় এ জাতীয় বই ছিল না। ১৯১৪-এ ঢাকার বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষার প্রথম থিসরাস। নাম যথাশব্দ, লেখক মহম্মদ হাবিবুর রহমান। রোজের থিসরাসের হুবহু বঙ্গানুবাদ এটা—তাই বেশ কিছু গোলমাল থেকে গেছে এতে। এর আগে ১৯০৪ সালে প্রাণতোষ ঘটক 'বচনমালা' নামে একটা ছোটো থিসরাস লেখেন। কিন্তু এটা এতই ছোটো যে বিশেষ কোনো কাজে আসে কি করও। ১৯৮৯-তে একটি 'বাংলা-ইংরেজি বহুতাত্ত্বিক থিসরাস তথা 'অভিধান' প্রকাশিত হয়। লেখক জগন্নাথ চক্রবর্তী। বইটির নাম 'মণিমঞ্জুষা'। সংস্কৃত 'অমরকোষ'-ও এক ধরণের থিসরাস। আশাকরি অনেকেই এই বইগুলি দেখেছেন, ব্যবহারও করেছেন।

শুনতে বলা হয়েছে থিসরাস অভিধানের উলটো। এতে বেশি কিছু বোঝা যায় না। কেন উলটো? ভাবটা মনে আসছে অথচ জুতসই শব্দ আসছে যা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন কাজে লাগে থিসরাস। আরও বিশেষভাবে লাগে প্রতিশব্দ পাওয়ার জন্য। কোনো শব্দের সমজাতীয় শব্দ,সমার্থবাচক শব্দ, সংজ্ঞা, আনুষঙ্গিক প্রাসঙ্গিক শব্দাবলিও একত্রিত হয়ে থাকে থিসরাসে। কাজের সুবিধার জন্য এই একত্রীকরণটি হয় কতগুলি প্রধান শব্দের আওতার মধ্যে।

কিন্তু কীভাবে নির্বাচিত কিংবা নির্ধারিত হবে এই প্রধান শব্দ? এর কি কোনো স্বাভাবিক নিয়ম আছে? কতদূর বিস্তৃত হবে আনুষঙ্গিক শব্দের আনুষঙ্গিকতা? এরকম আরও হাজারো প্রশ্ন। এগুলির উত্তর পাওয়া একটা সময়ে বর্তমান বক্তার কাছে ছিল জরুরি ব্যাপার, কেননা একটা বাংলা থিসরাস তৈরির প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। আর সে প্রক্রিয়ার পথ নেহাতই ঘাসেরুল মনোরম ছিল না। ১৯৮৭-প্রথম প্রকাশিত সে বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণের নামপত্র দেখানো হল ছবিতে। অনেকে হয়তো দেখেও থাকবেন। সে প্রসঙ্গ থাক এখন, বরং আলা যাক আজকের মূল বিষয়ে। বাংলা থিসরাস লক্ষণ—কোনো তত্ত্বের বিশ্লেষণ নয়, নেহাতই কিছু অভিজ্ঞতার কথা।

থিসরাস সংকলিত হতে পারে দুভাবে। এক, বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে, যেমন থাকে অভিধানে। মণিমঞ্জুষা, ইংরেজি কলিন্স থিসরাস এ ধরণের কাজ। দুই, বিষয়ানুযায়ী বিন্যাস। রোজের থিসরাস, তার বঙ্গানুবাদ 'যথাশব্দ', সমার্থশব্দকোষ—এই দ্বিতীয় ধরণে তৈরী। দুটি ধরণের মধ্যে দ্বিতীয়টি আমার অনেক বেশি কাজের বলে মনে হয়। কেন হয়, সে আলোচনায় পরে আসছি।

একটা ভাষার ভাবে শব্দকে কিছু সংখ্যক খোপের মধ্যে বন্দী করার পূর্বশর্ত থাকে থিসরাস তৈরিতে। এই খোপগুলোর নাম কিংবা পরিচয়ই হল প্রধানশব্দ—যেমন

দেখানো হয়েছে প্রথম তিনটি পৃষ্ঠার ছবিতে। বলে রাখা ভালো কোনো ভাষার শব্দাবলিকে কিছুসংখ্যক গুচ্ছে ভাগ করা চলে না—তার অর্থাৎ গুচ্ছ বা খোপের সংখ্যা যতই হোক না কেন। এই খোপবন্দির কাজটা একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া যা ভাষার স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। এর পরে কোনো অরাটা যুক্তিও খাড়া করা যায় না। রোজে তাঁর বিদরাসে এক হাজার খোপের মধ্যে ইংরেজি শব্দাবলিকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বইতে প্রধান শব্দ কী তা অনেকেরই জানা। রোজের বিভাগীকরণ বিষয়ে অনেক পর্যালোচনা, সমালোচনা হয়েছে। এ আলোচনা আমরাও একটু পরে করব।

তার আগে কোনো গভীর তত্ত্বের মধ্যে না গিয়েও কোনো ভাষার শব্দাবলি সৃষ্টির পিছনের কারণটা একটু দেখা যাক। বলা যায় কোনো ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির পিছনে আছে মানুষের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি—হতে পারে তা ব্যবহারিক মানসিক কিংবা অন্য কোনো ধরণের। এ বিষয়ে অন্তত প্রকাশিত একটি লেখার অংশ উদ্ধার করি। কতরকমের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি হতে পারে মানুষের? এটা অবশ্যই দেশ কাল সামাজিক পরিবেশ ও অন্যান্য অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল। এই অভিজ্ঞতার গতি প্রতিক্ষণেই প্রসারিত হচ্ছে, নতুন শব্দসৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে অবিরত। প্রতি বছরই বেশ কিছু নতুন শব্দ আসছে বাংলা ভাষাতেও—হয়তো একই সঙ্গে কোনো প্রতিষ্ঠিত শব্দের ঘটছে অবাস্তর। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি যত রকমের হতে পারে, তাদের প্রতি শ্রেণীবদ্ধ করা যায়? তার ধ্যান ধারণাকে,—একদম ঠিক ঠিক না হলেও, সাধারণভাবে কি কতগুলো বিষয়ে ভাগ করে ফেলা চলে? এই ভাগ করতে গিয়ে কিছুটা হেরফের হবে, এটা মেনে নিয়েও যদি হয়? অবশ্যই হেরফেরের মাত্রাটা যত কম রাখা যায় ততই ভালো। একটা মজেস হাতের কাছে পাই, তা হল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বর্গীকরণ পদ্ধতি। ঠিক একই রকম না হলেও তুলনীয়। (বারোমাস—শারদীয়া-১৯৮৮)।

এ প্রসঙ্গে 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বর্গীকরণ পদ্ধতির' উল্লেখ যে অপরিহার্য ছিল, তার কারণ এই পদ্ধতির প্রতি আমার আকর্ষণ অনুরাগ দীর্ঘদিনের। যদি একটু ব্যক্তিগত কথায় আপত্তি না করেন তাহলে বলি, আপনাদেরই এই সংস্থার কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীর কাছে এ ব্যাপারে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। সেসব কৌতূহল যখন করতে না পেরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির ডিনতলায়, বই-এর গায়ে লাগানো নম্বর দিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় সুযোগ পাই। সে ১৯৬৫/৬৬ সালের কথা। তাঁরা আনন্দের সঙ্গেই প্রশ্রয় দেন, কৌতূহল নিবারণে সাহায্য করেন। অ্যারেঞ্জমেন্ট বা গোছানো যে একটা বৈজ্ঞানিক বিষয় তা অল্প কষতে গিয়ে ভাবতে হয়েছে। কিন্তু সেই পদ্ধতি যে মননের জগৎকেও সাজিয়ে দিতে পারে একটা পদ্ধতির মধ্যে তা জানা ছিল না।

তখনও পর্যন্ত বাংলা বিদরাস রচনার হাত লাগানোর কোন পরিকল্পনা ছিল না। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল ১৯৭৬ সালে। ঘটল নেহাতই আকস্মিকভাবে। যাদবপুরের এক বই-এর দোকান থেকে একটা রোজের বিদরাস কিনে ৮-বি বাসের দোতলায় বসে বইটি খুলতেই মনে হল, বাংলায় কেন একটা এমন বই হবে না? হোক বা না হোক চেষ্টা করা যাক একবার। ঢাকা থেকে ১৯৭৪-এ প্রকাশিত 'বর্ণমালার' খবর তখনও জানা ছিল না আমার। ১৯৭৬-এ যার শুরু তার প্রথম পর্বের শেষ ১৯৮৭-র জানুয়ারিতে যেদিন প্রকাশিত হল বইটি সাহিত্য সংসদ থেকে, অভিধান প্রকাশনায় যাদের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে এদেশে। পরবর্তী পর্যায়ের কাজ চলছে। এ কাজের তো শেষ নেই কোনো।

কাজের শুরুতেই ওঠে বাংলায় ব্যবহৃত শব্দকে ভাগ করার প্রশ্ন। তাই অনেক উনটে পালটে দেখতে হল রোজের বিদরাসকে। প্রথমেই মনে হল, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার ধাত আলাদা। দ্বিতীয়ত যে জিনিসটি লক্ষ করা গেল তা হল রোজের শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতিটি। উনি সমস্ত শব্দের জন্য ছয়টি প্রাথমিক শ্রেণী বা বর্গ

ঠিক করলেন। Abstract relation, Space, Matter, Intellect, relation, Affection। প্রথম শ্রেণী Abstract relation-এর আট ভাগ existence. relation, quantity, order, number, time, change। এই গুলোকে বলতে পারা উপশ্রেণী। প্রথম উপশ্রেণীর অধীনে প্রধান শব্দ আট, existence, non-existence, substantiality, unsubstantiality. subjectiveness, objectiveness, state, circumstance। দ্বিতীয় উপশ্রেণীর (relation) মধ্যে প্রধান শব্দ বোলোটি। তৃতীয় উপশ্রেণীর প্রধান শব্দ তেইশটি। এভাবে প্রথম শ্রেণীর আটটি উপশ্রেণীর মধ্যে প্রধান শব্দ একশো উনআশি। দ্বিতীয় শ্রেণী space-এর প্রধানশব্দ একশো ছত্রিশ। এইভাবে ছয়টি শ্রেণীতে প্রধানশব্দ এক হাজার। ক্রমিক সংখ্যাসূচীর এক নম্বর শব্দ existence, হাজার নম্বর temple। লক্ষণীয় 'যথাশব্দের' এখনথেকে পাই 'অস্তিত্ব', হাজার নম্বরে 'দেবালয়'।

রোজে যেভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন তা ঠিক না ভুল, সে তর্ক চলছে আজও। অবশ্য এখনকার অনেক সংস্করণে তাঁর ওই শ্রেণীবিভাগের অনেক বদল হয়েছে, কিন্তু আসলটি বদলায় নি বিশেষ। কিন্তু শ্রেণীবিভাগ যেভাবেই হোক না কেন, সাধারণ পাঠকদের তাতে খুব একটা এসে যায় না। কোনো বিশেষ শব্দের সম্পর্কিত শব্দ খুঁজতে তিনি প্রথমেই দেখেন বর্ণানুক্রমিক সূচী। সেখান থেকে হদিশ পান কোন প্রধান শব্দের মধ্যে তা আছে। আর তাতেই কাজ হয়।

রোজের বিষয়ভাগ যে তর্কের ঊর্ধ্বে ছিল না একথা বলা হল। একটু খতিয়ে দেখা যাক বিষয়টা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কর্মী ও গবেষকরা কিছু ভাবনার খোরাক পেতে পারেন এর থেকে। এই বিন্যাসের (ক্লোয়েল সংস্করণ, ১৯১৩, ১৯২-তম মুদ্রণ ১৯৭৩) তিন নম্বর শ্রেণী matter-এর উপশ্রেণী তিনটি (matter) in general, inorganic, organic—যেন একটু কেমিস্ট্রির মতো লাগে। Organic-এর দুটো ভাগ—vitality আর sensation। শেষেরটাকেই নেওয়া যাক। senastion এর অধীন প্রধান শব্দগুলোর কয়েকটা এইরকম। physical sensibility (৩৭১); physical pain (৩৭৮); touch (৩৭৯) refrigerator (৩৮৭); taste (৩৯০); silence (৪০৩); music (৪১৫); musician (৪১৬); musical instruments (৪১৭); luminaries (৪২৩)। এর থেকে মনে হতেই পারে music কিংবা refrigerator এক ধরণের sensation কিংবা ওই সংক্রান্ত ব্যাপার, আর তারা organic matter-এর অন্তর্ভুক্ত।

শব্দকে প্রথমে শ্রেণীতে, তারপর উপশ্রেণীতে, তারপর আবারও তাতে ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করলে শ্রেণীর সাধারণ ধর্ম তার অন্তর্গত সব কিছুতেই বর্তাবে এ অনুমান অযৌক্তিক নয় আদৌ। রোজের বই থেকে এ ধরণের উদাহরণ আরও দেওয়া চলে। যেমন, organic matter-এর মধ্যে প্রথমেই আসে life (৩৫৯)। life এক ধরনের organic matter কিনা এ তর্ক উঠতেই পারে। সে তর্কে যাব না। Life-এর মধ্যে এল animal-আসতেই পারে। তাদের থাকে 'সেনসেশন' বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি। এর মধ্যে আসে heat light sound এইসব। heat-এর বিপরীত cold—তার থেকে এসে যায় refrigerator। ফলে refrigerator (৩৮৭) চলে আসে organic matter-এর আওতায়। এইভাবেই রোজের বইতে পাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য sound থেকে music, musician, musical instruments সবই যেন organic matter। আবার light থেকে luminaries (৪২৩)। তাতে ঢোকে sun star যেন এরাও organic matter। এখনকার সংস্করণে এ শ্রেণীবিভাগের কিছু অদল বদল হয়েছে।

একথা বলা হয় যে রোজ নিজে ছিলেন ডাক্তার। তাই তাঁর বিভাগীকরণে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের থেকেও হয়তো বা বেশি কাজ করেছে শারীরবৃত্তের ধারণা। এটা সত্যি যে 'লাইফকে organic matter হিসেবে

টিন্তা করার মধ্যে একটা তাড়াহুড়ি পড় পাওয়াই যায়। শব্দের শ্রেণীবিভাগে রোজে সম্ভবত জীবজগতের শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে তার গভীর জ্ঞানের প্রভাব কাটাতে পারেন নি। তাঁর মডেলটা অনেকটাই এককোষী বহুকোষী মেরুদণ্ডী অমেরুদণ্ডী, কিংবা গণ-প্রজাতি ইত্যাদি নিয়ে গড়ে-ওঠা শ্রেণীবিভাগের মতোই হয়েছে। কিংবা বলা চলে বহু আলোচিত 'এভস্টাইন ট্রি'র মতো। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে এরকম অনুনিষ্ঠর শ্রেণীবিভাগ কি হয়? যে নিয়ম ধরেই শুধু করা যাক, তার ব্যতিক্রম এতই চলে যে নিয়মটাকেবেদিদর টেনে নেওয়া যাবে না।

সংস্কৃত 'অমরকোষ' বস্তুত একটি থিসরাস, যেখানে শব্দ শর্তগুলো বর্গে ভাগ করা, আর কোনো বর্গই অন্য বর্গের অধীন নয়। কোনো বাঁধ-ধরা নিয়মও ছিল এই বর্গ-ভাগের। অমরকোষ তিনটি কাণ্ডে সাতাশটি বর্গ। প্রথম কাণ্ডে—স্বর্গ, বেজম, দিক্, কাল, শব্দাদিধী, নাটা, পাতালভোগী, নরক, বারি এই দশটি বর্গ। দ্বিতীয় কাণ্ডেও বর্গসংখ্যা দশ-ভূমি, পুর, শৈল, বনৌষধি, সিংহাদি, মনুষ্য, ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। তৃতীয় কাণ্ডে বিশেষ্যত্রি, সংকীর্ণ, নানার্থ, অব্যয়, লিঙ্গাদি সংগ্রহ, ব্যাখ্যাবলোগ, সংহার। প্রতিটি কতগুলি শ্লোকে পর্যায় শব্দ দেওয়া আছে। পর্যায়শব্দ বলতে এরই পর্যায়ের অর্থাৎ সমার্থক শব্দের কথাই বলা হয়েছে। যেমন,

> খনঃ শর্পনো বায়ুর্মাতরিশ্বা নভস্বগুস্তি :
> পৃষদশ্বো গন্ধবহো গন্ধবত্তা জিলাশনগা : ।
> সমীর-মারুত-মরুত জগৎপ্রাণ-সমীরণ :
> নভস্বদ্বাত পবন পবমান প্রভঞ্জনা :

(আরও আছে এর সঙ্গে প্রসঙ্গনো মৃগবাতে উত্যাদি) এই শ্লোকে পাই বাতাসের পর্যায়শব্দ। খনঃ, শর্পনঃ, বায়ুঃ, মাতরিশ্বা, সদাগতিঃ, পৃষদশ্বঃ, গন্ধবহঃ, অনিলঃ, আশুগঃ, সমীরঃ, মারুতঃ, মরুৎ, জগৎপ্রাণঃ, সমীরণঃ, নভস্বান্, বাতঃ, পবনঃ, পবমানঃ, প্রভঞ্জনঃ। অমরসিংহের 'অমরকোষ' একটি অসাধারণ থিসরাস তথা অভিধান। তবে নির্ঘণ্ট না থাকায় কোন বিশেষ শব্দকে খোঁজার সুবিধে ছিল না। অমরসিংহের আমলে বর্ণানুক্রমিক সূচি জিনিসটা অজানা ছিল।

আগে বলা হয়েছে বাংলা ভাষার প্রথম 'সমার্থাভিধান' প্রাণতোষ ঘটকের 'চয়মালা' (১৯৫৫)। বর্ণানুক্রমে সাজানো ছোটো এই বইয়ের ভূমিকায় আছে, 'আমি এই সঙ্কলনে বাংলা শব্দের প্রতিশব্দ, সমার্থ বা সমপর্যায়ভুক্ত শব্দসমূহ সঙ্কলন করতে সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু তাঁর সঙ্কলনে সর্বদাই যে প্রধানদের পর সমার্থশব্দ দেওয়া আছে তা নয়। যেমন প্রথম এন্ট্রি।

'অংশ—খণ্ড, খণ্ডাংশ, সম্পূর্ণ বা দেবাংশে জ্ঞাত, রাশি চক্রের ত্রিংশ ভাগের এক ভাগ।' এখানে অংশ শব্দের নানার্থ পাওয়া গেল, সমার্থ নয়।

'অক্ষ—পাশা, গাড়ির চাকার ধুরা, জ্যোতিষিক কাল্পনিক রেখা, জপমালার বীজ, ছিদ্র, চক্ষু।' এখানেও তাই। কিন্তু 'অতিথি—অভ্যাগত, গৃহাগত, আগন্তুক'। এরা সবাই সমার্থক। এই বইতে সমার্থ, নানার্থ, বিবিধার্থ প্রায়শই গোলমাল হয়ে গেছে। সম্ভবত এই কারণেই তেমন শুচার হয়নি বইটির।

বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়া চ'ম্বার 'যথাশব্দে' মুখ্যত হ্যারিয়ট হুম্যান রোজেটের দ্বারা অনুসরণ করেছেন। প্রধানশব্দ সংখ্যা এক লাখের। এই অনুসরণে আপত্তি নেই কিন্তু, হাজার খোপে ইংরেজি শব্দকে বন্দি করা গেলে বাংলাকেও যাবে না কেন? কিন্তু যথাশব্দ বইটি ভালো করে দেখলে মনে হয়, এই ছত্তাবানোটা বেশ কঠিন কাজ—প্রতিপদেই হোঁচট খেতে হয়। ইংরেজির জুতো পায়ে দিয়ে বাংলা হাঁটতে পারে না। কয়েকটা উদাহরণ দেখা যাক যথাশব্দ বই থেকে।

এর প্রথম শ্রেণী 'অস্তিত্ব'। উপশ্রেণীতে আছে 'সম্পর্কসূচক ভাবার্থক শব্দ'। রোজের বইতে words expressing abstract relations। এর অধীনে প্রধান শব্দ, অস্তিত্ব (১), অনস্তিত্ব (২), নায়বত্তা (৩), অসায়ত্ব (৪), আত্মমুখতা (৫), বিষয়মুখতা (৬), অবস্থা (৭),

পরিস্থিতি(৮)। অস্তিত্বের মধ্যে অন্যতম প্রধানশব্দ সারবত্তাকে আপনারা মানবেন কি না সেটা প্রধান তর্ক নয়। বরং দেখা যাক সারবত্তার সমার্থক ও আনুষঙ্গিক শব্দ কী আছে এতে।

'৩ সারবত্তা—বি. সারবত্ত-সারত্ত-সারত্ত প্রকৃতত্ব ব্যক্তি বিষয় দ্রব্য। সত্তা সৃষ্টি প্রাণ দেহ সারপদার্থ। মূলভিত্তি বুনিয়াদ। ভড়ত্ব পার্থিবত্ত' ইত্যাদি। প্রশ্ন হতে পারে 'জড়ত্ব' পার্থিবত্ত', কি সারবত্তা? 'সৃষ্টি' 'প্রাণ' এরাও কি তাই? এটা ঘটে কী করে তাহলে। ইংরেজিকে অনুসরণ করতে গিয়ে। কেমন করে জানা গেল তা? আরও দুটো একটা উদাহরণেই তা স্পষ্ট হবে।

নেওয়া যাক ৩৪২ নম্বর শব্দ 'আবির্ভাব'। এই শব্দের সমার্থক ও আনুষঙ্গিক শব্দ বিষয়ে অনুসন্ধান করা খুব দুরূহ কাজ নয়। যথাশব্দে পাই,

'৪৪২ আবির্ভাব—বি. আবির্ভাব প্রকাশ উদয়। অভ্যুত্থান উত্থান সমুত্থান। দৃশ্য দৃশ্যপট। সমুদ্দৃশ্য, দৃশ্যত্ব চুচিত্র। সীন সীনারি।' এর পরেও আছে 'সিনেমা বায়োস্কোপ চলচ্চিত্র মূর্তি। দৃষ্টিকোণ দৃষ্টিভঙ্গি। ধরা কলা। আওার চাহনি ভাবভঙ্গি আচরণ।' বাংলা ভাষার সঙ্গে যাদের সামান্যতম পরিচয়ও আছে তাঁরাই ভাববেন আবির্ভাব থেকে সমুত্থান, সেখান থেকে দৃশ্য সিনেমা ভাবভঙ্গিতে পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপারটা আবিভাবে জন্ম উৎপত্তি, নেই কেন? তাহলে যেতে হয় মূলে। রোজের বইতে অনুরূপ জায়গায় ছিল appearance। এর অন্তত দুটো মানে হয় অবয়ব বা চেহারা কিংবা আগমন বা আবির্ভাব। রোজের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমটা, অনুবাদে ব্যাপারটা উলটে গেছে।

৩৫২ নম্বর শব্দ 'বায়ুপ্রবাহ'। এই শব্দটির মধ্যে পাই 'শোঁকা নিশ্বাস প্রশ্বাস ফুঁ হাঁড়ি'। মানা গেল, কারণ এসব কাজে তো বায়ুপ্রবাহের ব্যাপারটা আছেই যথাশব্দে এই প্রসঙ্গেই পাই 'বাঁশি বাজানো নস্যি নেওয়া'। বাঁশি বাজাতে বাতাস লাগে, কিন্তু শুধু বাঁশি কেন? হারমোনিয়াম, শিঙা, ক্ল্যারিওনেট বাজাতেও লাগে। আর কেন শুধুই নস্যি নেওয়া? সিগারেট টানা গাঁজায় দম দেওয়া, কলকে টানানো—এসব কাজেও তো বায়ুপ্রবাহ দরকারি। কেবল 'নস্যি নেওয়া' কেন? রোজের মূল খুললে উত্তরটা পাওয়া যায়। এখানে ৩৪৯ নম্বর শব্দ wind (in motion)এর মধ্যে আছে snuff sniffle। তাদের অর্থ শব্দ করে নিশ্বাস নেওয়া। অনুবাদে হয়ে যায় নস্যি নেওয়া'। এই অনুবাদের গোলমালেই নুমিনারি হয়ে জ্যোতিষ্ক (৪২১)। তাতে স্থান পায় সূর্য চন্দ্র গ্রহ থেকে আরম্ভ করে মোমবাতি বাল্ব টর্চলাইট পর্যন্ত অনেক কিছু। বাংলা ভাষায় যে কোনো 'আলো'র উৎসই জ্যোতিষ্ক হয়।

সমার্থশব্দকোষ পরিকল্পনার সময় এই ব্যাপারগুলো বুঝতে হয়েছিল। কাজের শুরুতে অবশ্য 'যথাশব্দ' হাতের কাছে ছিল না, কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য এসে যায় হাতে। এ থেকে শিক্ষা হয় যে ওই প্রক্রিয়ায় কাজ হবে না। রোজের বিভাগীকরণ থেকে বোঝা যায় যে উদ্ভিদ কিংবা জীববিজ্ঞানের মডেলে শ্রেণীবিভাগের অসুবিধে। 'অমরকোষ' দেয় বর্গের ধারণা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ল্যাসিফিকেশন থেকে স্থির করে নেওয়া যায় যে কোনো একটা বিষয়ের শব্দ ও তার আনুষঙ্গিক শব্দ কাছাকাছি থাকলে পাঠকের সুবিধে, বই-এর ব্যাকে একই বিষয়ের বই পরপর পাওয়া যেমন সুবিধাজনক। আর অবশ্যই একটা বর্ণানুক্রমিক সূচি থাকবে শব্দ খোঁজার জন্য। গঠনটা হবে রোজের বই-এর সঙ্গেই, তবে সাজানোটা হবে অক্ষরক্রম। এই হল প্রাথমিক প্রস্তুতি।

কিন্তু কতগুলি বিষয় হবে? কতগুলি প্রধানশব্দ? আগে থেকে তা ঠিক না করে দেখাই যাক না অন্তভাবে চেষ্টা করে। অর্থাৎ শেষটাকে আগে থেকে ঠিক না করে শব্দ সংগ্রহ করেই দেখা যাক না ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়। তাই মাঝারি মাপের একটা বাংলা-বাংলা অভিধান অনুসরণ করেই কাজ শুরু করা। সবল ছোটো লেখার প্যাড, আর কিছু বড়ো ব্রাউন খাম।

প্রথমেই পাওয়া গেল অসংখ্য শব্দ, তা লেখা চল কাগজে। তখুনি মনে এল ঋণ, আর তা থেকে টাকা পয়সা অর্থবিত্ত প্রভৃতি বিষয়ের একটা বড়োসড়ো বিভাগের ইঙ্গিত। ঋণ প্রসঙ্গে যা মনে এলো লেখা কাগজে—ধার, কর্জ, মহাজন, উত্তমর্ণ, অধমর্ণ, সঙ্কট, ঋণশোধ, ঋণমুক্ত যা যা মনে আসে লিখে ফেলা হল কাগজটায়, আর তা গেল একটা খামে।

পরের শব্দ অংশ থেকে সম্পূর্ণতা, পরিমাণ পরিমিতির কথা মনে আসে। এদের জন্যও তৈরি হয় কাগজ আর যথারীতি খাম। অংশের কাগজে লিখে ফেলা যায় ভাগ টুকরো, টিনতে। পরে অংশীদার থেকে পাওয়া যায় ভাগ-বাটোয়ারা। পরের শব্দ অঙ্গ থেকে আসে আলো, অঙ্গ ইঙ্গিত দেয় শরীরের অংশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের। প্রথমদিকে প্রায় প্রতিটি শব্দের জন্যই খুলতে হয় নোতুন কাগজ নোতুন খাম। কিন্তু অ-আদি শব্দ শেষ হওয়ার আগেই দেখা যায় যে তার প্রয়োজন কমে আসছে। অভিধানের শব্দগুলো কোনো না কোন জায়গায় খাপ খেয়ে আছে। এরপরও যে নোতুন কাগজ কিংবা খাম খুলতে হয় না হয়, তবে তার সংখ্যা খুবই কম। এইবার যে ভাগগুলো হল তাকে একটু ঝাড়াই বাছাই করলে এমন কতগুলো বিষয়কে শনাক্ত করা যায়, যার মধ্যে চলে আসে প্রায় সব শব্দ। এইরকম ভাগের আখ্যা আশির কাছাকাছি। এই ভাগগুলো অবশ্যই স্থির ধ্রুব অনড় পরিবর্তনীয় হয়। সকল পার্থিব বস্তুর মূল উপাদান ১০৩টি মৌল—এটা যে অর্থে সত্য, আশি-পচাশিটি ভাগে সব শব্দকেই শ্রেণীবদ্ধ করা চলে—এটা সে অর্থে সত্য হয়। হতেও পারে না। বস্তুত আমাদের ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রকে বিষয়বদ্ধি করা যায় না। তবে বিষয়াস তৈরীতে কিছু ডিগ্রি অব অ্যাপ্রক্সিমেশন মানতেই হয়। শুধু এখানে কেন, যে কোনো ব্যাপারের তাত্ত্বিক ও ফলিত রূপের মধ্যে ফারাক থাকে। কোথায় কোনটা কতটা মানব তা নির্ভর করে কাজের ধরনের ওপর। ট্রেন ধরার জন্য ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার দরকার হয় না, কিন্তু ক্যামেরার সাটার স্পিড নির্ণয়ে সেকেণ্ডের হাজার ভাগকে উপেক্ষা করা চলে না। ফুটবল মাঠের মাপজোখে পৃথিবীর গোলকাকৃতি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। কিন্তু মেলবোর্ণ থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত কোন সমুদ্রপথ সবচেয়ে কম জানার জন্য ওই গোলকাকারের ব্যাপারটা বাদ দেওয়া চলে না। ভাগের ক্ষেত্রে জিনিসটা আরোই গোলমেলে। যাইহোক আবার ফিরে যাই লোহা'সার প্রসঙ্গে।

গায়েবদ্দি কাগজের টুকরোগুলোকে এবার ছোটো ছোটো শ্রেণীতে একত্রীকরণের কথা। এবার দরকার শ্রেণীগুলোকে চিনে নেওয়া। এর জন্য কতগুলো স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হল, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পদ্ধতির। অর্থাৎ সংখ্যা দেওয়া হল প্রতিটি বিষয়ের জন্য। বিন্দু দিয়ে আলাদা-করা তিনটি সংখ্যা। বিষয়ের জন্য প্রথম সংখ্যাটি, সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কিংবা বিপরীতের জন্য দ্বিতীয়টি, আর প্রধান শব্দের জন্য তৃতীয় সংখ্যাটি। যেমন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-৪, শব্দ-১, শব্দ-১, তাহলে প্রধানশব্দ 'শব্দের জন্য নম্বর ৪. ১. ১ ; চিৎকার ৪. ১. ২ কৈ: শব্দ ৪. ১. ৩। ৪. ৫. ১ হল গন্ধ, ৪. ৬. ২ হল স্বাদ। ক্রমটা ঠিকই আছে—৪ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ৪. ৫ গন্ধ, ৪. ৫. ১ প্রধানশব্দ গন্ধ। এটাও কিন্তু আরো একধাপ এগোনো প্রাথমিক ধাপ। শ্রেণীকরণকে আরও একটু গুছিয়ে নেওয়া।

এবার শব্দগুলো স্থানান্তরিত হল বড়ো কাগজে। ওপরে নম্বর ১২. ২. ৪ বা ওই জাতীয় কিছু। এবার আবারও শব্দসংগ্রহ, শব্দটি কোন কাগজে যাবে তার বিচার ও সেই কাগজটি বার করে তাতে লিখে ফেলা। এ কাজের কোনো সর্টকাট নেই। কেবলই ধৈর্য ধরে লিখে চলা। কাজ করতে করতে আরও একটা নোতুন ভাগ করার কথা মনে এলেও কোনো অসুবিধে নেই, কারণ হয়তো ১৩. ৪. ৩ পর্যন্ত নম্বর হয়ে আছে। সহজেই ১৩. ৪. ৪-এ আর একটি নম্বর খোলা যায়। এমনকী ১৩. ৪ এর পর ১৩. ৫ও খোলা চলে। তেমনি বাড়ানো চলে প্রথম সংখ্যাটিকেও। অতএব দশমিক বিন্দু দিয়ে

পৃথক-করা তিনটি সংখ্যার কোনো জায়গাতেই আটকে যাওয়ার ব্যাপার নেই। শ্রেণীকরণে এই পদ্ধতির তাৎপর্য নিশ্চয়ই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী গবেষকরা সহজেই বুঝতে পারবেন। এইভাবে সাজে। কাগজে হল দ্বিতীয়বার লেখা।

এবার শব্দের পর্ব। চাই ক্রমিক নম্বর আর পরিচ্ছেদ ভাগ। আগেই দেখানো হয়েছে মূল বিষয়গুলি কী কী? এ বিষয়গুলো আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া হয়, শব্দ বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেই উঠে আসে। এই বিষয়গুলির কয়েকটি নিয়ে কোনো বর্ণ বানানো যায় কিনা। যার মধ্যে একটা লজিক থাকবে, একটা ক্রম থাকবে। কিন্তু একটার ওপর নির্ভরশীল হবে না অন্যটা। অনেক চিন্তাভাবনার পর এইরকম দাঁড়াল বিষয়গুলো। মহাবিশ্ব প্রকৃতি-পৃথিবী-গাছপালা; প্রাণ-প্রাণী পরীর; ইন্দ্রিয়-অনুভূতি; বাস্তবতা—অস্তিত্ব-সংরক্ষণ; কাল-ঋতু বছর ইত্যাদি। এদের অধীনে প্রধান শব্দের তালিকাও তৈরি হল, যা হয়েই ছিল তথাকথিত ডেসিমাল 'ক্ল্যাসিফিকেশনের' খাতায়। প্রতিটি প্রধান শব্দের নম্বর সেই অনুযায়ী আবার লেখা হল বইটি।

এইবার এল ক্রস-রেফারেন্সের বিষয়। বিস্তর ক্রস-রেফারেন্স আছে বইতে। আর তা ওলেছে চুতাবে। শব্দের পর বন্ধনীর মধ্যে কোনো সংখ্যা। আর বন্ধনীর মধ্যে 'ক্রস'-এর পর কোনো সংখ্যা। একই শব্দ একই অর্থে কিংবা কাছাকাছি অর্থে একাধিক জায়গায় থাকতে পারে। সেখানে শব্দটি কোথায় কোথায় আছে তা বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যায় দেখানো হয়েছে। একে বলা যেতে পারে গৌণ রেফারেন্স। অন্যটি মুখ্য রেফারেন্স বা 'মু'-চিহ্নিত। যেমন স্রোত শব্দটি একবার আসে জলপ্রবাহের মধ্যে, অন্যবার প্রবাহের মধ্যে।

এইবার পাণ্ডুলিপি তৈরি। তার কয়েকটি পৃষ্ঠার নমুনা দেখানো যেতে পারে এখানে। কোনো কোনো বিষয়ের ক্রমিক নম্বরকে আবারও ভাগ করতে হয়েছে দশমিক বিন্দু দিয়ে। যেমন বিভিন্ন গাছের নাম, প্রাণীর নাম, ধর্মগ্রন্থ কিংবা দেবতার নাম।

রাগরাগিণীর নামের জন্য কিংবা এই ধরণের শব্দের জন্যও অন্যরকম ভাগ করতে হয়েছে।

এরও পরে থেকে যায় বর্ণানুক্রম সূচি তৈরী। এটা হয়েছিল পাণ্ডুলিপি থেকে। ছোটো ছোটো কার্ডে লেখা হল প্রতিটি শব্দ, আর যে প্রধান শব্দের মধ্যে আছে সে শব্দটি তার নম্বর। যেমন সূর্য ৫, অস্ত কার্ডে রবি ৫, অর্ক ৫, ভাস্কর ৫ এইরকম কার্ড হয়ে চলল। তা এক লক্ষ কার্ড তো হবেই। তারপর তাদের সাজানো হল বর্ণানুক্রমে। তার থেকে তৈরি হল বর্ণানুক্রমিক সূচিযুক্ত পাণ্ডুলিপি। অনেকদিন সময় লাগল সন্দেহ নেই। তবে কাজটা তো নেহাতই যান্ত্রিক। বর্ণানুক্রমিক সূচির কিছু ছবি দেখা যাক এবার।

এই তো সংকলন প্রক্রিয়ার বিবরণ। এটা নেহাতই একটা পদ্ধতির বর্ণনা। এটা অন্যরকমও হতে পারত। অন্য কেউ এর চেয়ে সহজতর উন্নততর পদ্ধতিও বার করে ফেলতে পারেন।

এবার, আপনাদের অনুমতি হলে অন্য প্রসঙ্গে আসি। প্রতিশব্দ, সমার্থশব্দ, সমবর্ণী সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক শব্দকে একত্র করার কোনো প্রতিশ্রুতি যদি থাকে বিদ্যালয়ের নির্মিতিতে, তাহলে সমার্থকশব্দ কিংবা প্রতিশব্দ তাকে বলে সে বিষয়ে একটা 'কাজ-চালানো' গোছের ধারণা করে নেওয়া দরকার। 'কাজ-চালানো-গোছের' ব্যাখ্যানেটা খুব জরুরি। কারণ দুটি শব্দ ঠিক সমার্থক কিনা, আদৌই তা হওয়া কি সম্ভব—এর মীমাংসাই অসাধ্য ব্যাপার। এ নিয়ে তুমুল তর্ক হলে তর্কটাই চলবে—বিদ্যালয় হবে না। জল-নীর-সলিল-বারি সবই তো একই জিনিসকে বোঝায়। তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র কিন্তু আলাদা। এদের পার্থক্য থাকে বলে নেটিকস্পিকার তাঁরাই ভালো বলতে পারেন—অন্যেরা পারেন না। 'চরণপদ্মে' যে ভক্তিভাবের ইঙ্গিত থাকে, তা ঠাট্টায় পর্যবসিত হয় 'ঠ্যাং-পদ্ম' শব্দে। তীর্থজল ভালো শোনায় না, তীর্থসলিল, তীর্থনীর, তীর্থবারি-ই চলে। এমন

কোনো নিয়ম নেই যে অপেক্ষাকৃত গুরু শব্দের (তীর্থ) সঙ্গে লঘু-শব্দ (জল) চলবে না। কারণ নেত্রজল, অক্ষিজল নয়নজল, আঁখিজল সবই আছে ব্যবহারে। কিন্তু চোখ ও জল এই দুটি সদ্ভাবাবহ শব্দের মধ্যে সমাস চোখজল হয় নি। আবার 'সাতসাঁটের জল খাওয়া যায়' বা সলিল হয়। সলিল সমাধিকে জলসমাধি করা যাবে না। তাহলে সমার্থকতা কি একটি অলীক ধারণা? এর উত্তর আপনারাই দিতে পারবেন ভালো।

এ তর্ক সত্ত্বেও বিশ্বাস-এর উপযোগিতা কম নয়। জানে কারা যাক বাতাস বিষয়ে কী কী শব্দ আছে, জানতে চান কেউ-(যেভাবেই তিনি তাকে কাজে লাগান না কেন); বর্ণানুক্রমিক সূচিতে দেখুন বাতাস (বায়ু কিংবা হাওয়া)। বাতাস শব্দের পাশে আছে নম্বর ২৯।

এবার নম্বর মিলিয়ে চলে আসা যাক ২৯ নম্বরে যেখানে সাজানো আছে বাতাস-প্রসঙ্গের শব্দ। এই সাজানোতেও একটা নিয়ম আছে—খুবই শিথিল যদিও এ নিয়ম।

পৃ-১৭৪, ১৭৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৯০, ১৯৮, ১৯২, ২০০, ১৬০, ১৬১, ১৬২ (explain নিয়ম)। বাতাস শব্দটি থাকছে প্রকৃতি বিষয়ক পরিচ্ছেদে। সংশ্লিষ্ট অন্য শব্দও থাকছে কিন্তু কাছাকাছি আবহাওয়া ৩০, ঝড় ৩১ নম্বরে। অন্য বিষয়েও এই নীতি অনুসৃত—যেমন জল ১১, নদী ১২, সমুদ্র ১৪, জলপ্রবাহ ১৫, জলাশয় ১৬, কূল ১৭, তরঙ্গ ১৮, মেঘ ১৯, বৃষ্টি ২০, প্লাবন ২১, এবং বিপরীতার্থক অনাবৃষ্টি ২২ নম্বরে।

অন্যদিকে অষ্টসিদ্ধি, পঞ্চতিক্ত, জেদ আবেদ্য কী তাও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

অভিধান আর বিশ্বরাস আলাদা জাতের কোষগ্রন্থ—একের প্রয়োজন অন্যে মেটাতে পারে না। বিশ্বরাসে শব্দ আছে, অর্থ নেই। দুন্দুভি কিংবা অরণি কাকে বলে তার উত্তর এখানে মিলবে না। কিন্তু দুন্দুভি যে একটা বাদ্যযন্ত্র, এবং তা আনদ্ধ শ্রেণীর, আর ওই পর্যায়ে যে ঢাক-ঢোল-কাড়া-নাকাড়া পণব আছে তা জানা যাবে। ছদিশ পাওয়া যাবে যে অরণির অন্য নাম চকমকি। হাতের কাছে জল রিপোর্ট শব্দ থাকলে বাছতে সুবিধে হয়-সন্দেহ নেই।

কোনো ভাষার বিশ্বরাস প্রধানত সেই ভাষায় গীর কথা বলেন, তাদের জন্যই লেখা হয়। অন্য ভাষাভাষী মানুষ, যেমন বিহারী-মাদ্রাজি জাপানি ইংরেজ-যারা বাংলা শিখেছেন, তাঁরা ব্যবহার করতেই পারবেন না এমন নয়, তবে তাঁদের নানারকম অসুবিধের পড়তে হতে পারে। কারণ সমার্থক শব্দ হলেও সব সময় তারা একের বদলে বসে না। 'চলে যাওয়া' শব্দের প্রসঙ্গে 'পালানো' শব্দটি আসে। আসে চম্পট দেওয়া, লম্বা দেওয়া, ভেগে পড়া। অন্যত্র কাজ থাকার প্রধান অতিথি সভা শেষ হওয়ার আগেই চম্পট দেন-এরকম লেখা হয়ে যেতে পারে তাহাড়া ভালোভাবে না জানলে। বিশ্বরাস থেকে শব্দ নিয়ে তাকে নির্বিচারে ব্যবহার করা সর্বাংশে নিরাপদ নয়।

বিশ্বরাস প্রধানত প্রতিশব্দের অভিধান, সাজানো বিষয়ানুযায়ী। বলতে দ্বিধা নেই এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ বাংলা অভিধানও কিন্তু বর্ণানুক্রমে সাজানো প্রতিশব্দের অভিধানই হয়ে আছে। শব্দের মানে করাটা সত্যিই খুব শক্ত কাজ। নিত্য ব্যবহার্য সাদামাটা শব্দের মানে করাই যায় না। টাইগার মানে কী? দিবাকর জানে কী? সন্ধিস্থল, তুঙ্গ অরুণ, ধবধবে কী? অর্থ কী? স্তৈমিত্য কাস্তার বৃত্তিমান শব্দের? ছোটোদের কাছে এ ধরণের প্রশ্ন শুনেছি সবাই। উত্তরও দিয়েছি যে যেমন পেরেছি। এইসব শব্দের মানে হিসেবে ছোটোরা যা শোনে তা এইরকম। টাইগার মানে বাঘ। এখানে মানে হল বঙ্গানুবাদ। টাইগারের মানে বলতে কেউ ব্যাঘ্র কিংবা শার্দূল বলবেন না। শিশুটির কাছে বোধগম্য হয় এমন শব্দই বলবেন। এই বোধের ভিত্তি তার তখনও পর্যন্ত অর্জিত অভিজ্ঞতা—যা পরিবেশ সমাজ অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। বাঘ শব্দের মানে না জানলে পরবর্তী প্রশ্ন হবে 'বাঘ মানে কী'। এর উত্তরে বাঘের ছবি দেখানো, চিড়িয়াখানা নাকিসে সিনেমা টিভিতে বাঘ দেখানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। কোনোরকম

বর্ণনা,—'একরকম জন্তু, বেড়ালের মতো কিন্তু মস্ত, গায়ে কালো ডোরা, লম্বা লেজ, হিংস্র'—সত্যিই কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু বাঘ নিয়ে কোনো বিপত্তি নেই —ছোটোরা ওটা জেনেই যায়। দিবাকর মানে সূর্য—এতেও ক্ষতি নেই, তারপর সূর্য ব্যাপারটা আছে শিশুর অভিজ্ঞতায়।

মানে জানানোর জন্য যে প্রক্রিয়ার ব্যবহার এখানে হল, তা বস্তুত অজানা প্রতীকটিকে (দিবাকর) কোনো জানা প্রতীকে (সূর্য) রূপান্তরিত করে দেওয়া। সরীসৃপ, বকযন্ত্র তুল্যমূল্যের মানে জানাতে গেলে এ ধরনের রূপান্তরে কাজ হবে না—দুঃকার সংজ্ঞা ব্যাখ্যা উদাহরণ : মানে বলতে তাহলে কখনো অনুবাদ, কখনো সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা, কখনো উদাহরণ আর প্রতীকের রূপান্তরণ—সবই মিলে মিশে আছে। ভেতরের চেষ্টাটা হচ্ছে কোনো অজানা জিনিসকে জানা জিনিসের মাধ্যমে চিনিয়ে দেওয়া। কিন্তু এই জানা শব্দ কোনগুলি? কোনো কি এমন শব্দতালিকা বানানো যায় যার মানে বা দ্যোতনা সব বাঙালীই জানবেন—তার থেকে বেশিও জানতে পারেন, আমরা বলছি সবচাইতে কম শব্দের এমন একটা তালিকার কথা। কোনো কি বাংলা অভিধান হয়েছে যেখানে কোনো শব্দের অর্থ হিসেবে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতে কেবল এই সব শব্দই আছে? বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে এ আলোচনা কেন, সে প্রসঙ্গে একটু পরেই আসছি।

অভিধান থেকে দুটো শব্দ নেওয়া যাক—হাতা আর চামচ। এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই শব্দদুটো ও তার মানে জানেন। আর কেউ এই জানার জন্য অভিধান দেখেন নি। কেমন করে জেনেছেন তাও মনে নেই। অভিধানে এ শব্দগুলো কীভাবে আছে?

হাতা—লম্বা বাঁটযুক্ত বাটি, দর্বি (চলন্তিকা)। রন্ধনাদি কার্যে ব্যবহৃত বাটিযুক্ত লম্বা ও লম্ব দণ্ড বিশেষ, দর্বি (সংসদ বাংলা অভিধান)। দর্বি (জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস)।

চামচ—মুখে খাদ্য তুলিবার ছোট হাতা (চলন্তিকা)। ক্ষুদ্র হাতা বিশেষ (সংসদ বাংলা অভিধান)। চমস, ক্ষুদ্র হাতা (জ্ঞানেন্দ্র মোহন)। উল্লেখিত আভিধানিক বিবৃতিগুলো থেকে সত্যিই কী পাই আমরা? চলন্তিকা অনুযায়ী চামচ বিষয়ে জানতে গেলে, হাতা কী তা জানতে হবে। 'হাতা জানার জন্য 'বাটি' ও বাঁট বিষয়ে জান থাকা চাই। বাটি হয়তো জানেন সবাই, কিন্তু 'বাঁট' যদি হয় অজানা? চলন্তিকার 'বাঁ' শব্দের একটিই অর্থ পাই - হাতল। উদাহরণ আছে,—ছুরির, কোদালের। বাটিরও যে বাঁট হতে পারে তার উল্লেখ নেই কোনো। থাকার কথাও নয়, কারণ বাটির বাঁট হাতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখাতেই জোর করে লেখা। কিন্তু 'হাতল' মানেও যদি কেউ না জানেন? চলন্তিকার হাতল অর্থে পাই 'হাত দিয়া ধরিবার কড়া', আংটা, বাঁট'। অর্থাৎ বাঁট থেকে হাতলে, হাতল থেকে আবার বাঁটে ফিরে আসা। জ্ঞানেন্দ্রমোহনে হাতা মানে দর্বি। কোনো সুবিধে হল? দর্বি বিষয়ে কী আছে ওই অভিধানে? ১. সাপের ফণা; ২. কাঠের হাতা, তাড়ু; ৩ হাতা, বৃহৎচামচ। হাতা থেকে শুরু করে দর্বি ঘুরে আবার হাতাতেই প্রত্যাবর্তন। সংসদ অভিধানের বিবৃতি থেকেও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া দুষ্কর। হাতা বিশেষ ধরনের হওয়া বিনা 'বাটিযুক্ত'। কিন্তু হাতা-চামচের এই আভিধানিক সংকটে কি মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে কিছু? হয় নি, কারণ দুটো শব্দই প্রাথমিক পর্যায়ের। যার মানে বাঙালিরা জেনেই যায়।

প্রসঙ্গটা তোলা হল এই কারণে যে কোন শব্দগুচ্ছে প্রতিশব্দ কীভাবে সাজানো হবে, তার নির্দেশ এই প্রাথমিক শব্দবিচার প্রয়োজনীয় ছিল। শব্দগুলো এখানে বর্ণানুক্রমে আসে নি। যার ব্যবহার বেশি তা এসেছে আগে। সর্বত্রই যে সুনির্ধারিতভাবে এ নিয়ম প্রয়োগ করা গেছে, তা নয়। তবে চেষ্টা ছিল এইরকমই।

আর দুটি প্রসঙ্গ তুলে শেষ করব। একটি প্রশ্ন বহু জিজ্ঞাসিত। শব্দ সংগৃহীত হল কীভাবে। সত্যি কথা বলতে কি, জাতীয় গ্রন্থাগার, শ্রীরামপুর লাইব্রেরি, সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরিতে দিনের পর দিন কাটাইনি আমি,

গ্রামেগঞ্জে টেপরেকর্ডার নিয়েও ঘুরি নি। বাড়ির মধ্যে যে অভিধান আছে, যা বই আছে—যা আপনাদের অনেকেরই আছে, তা থেকেই নেওয়া হয়েছে শব্দ।) এ ছাড়া সাময়িক পত্রিকা, রবীন্দ্রোত্তর কবিদের কাব্যগ্রন্থ, বিজ্ঞান ও মানবিকবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের বই থেকেই মূলত এসেছে শব্দগুলি। প্রথম সংস্করণে শব্দ ছিল প্রায় আশি হাজার। দ্বিতীয় সংস্করণে এক লক্ষ আট হাজার। আরও প্রায় দেড় হুলক্ষ শব্দ ধরা আছে যা এখনও দেওয়া যায় নি বইতে।

পরের প্রসঙ্গটা শব্দ বিষয়ে। কোন শব্দের কত প্রতিশব্দ আছে, তা থেকে সেই ভাষা যারা ব্যবহার করেন, তাঁদের সমাজ বোধ সংস্কৃতি বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি? এস্কিমোদের ভাষায় বরফ বিষয়ে প্রায় কুড়িটি শব্দ আছে—যা ইংরেজি ভাষায় নেই। সংস্কৃত ও অনেক বিদেশি শব্দ আছে বাংলায়। জল শব্দের পঁচিশটির মতো প্রতিশব্দ পাই বাংলায়। ইংরেজিতে মাত্র কয়েকটা। কিন্তু ভেজানো, আর্দ্রীকরণ, সিকন-এর ভাব প্রকাশক শব্দ ইংরেজিতে অনেক আছে। মেশিন, টুল, অ্যাপারাটাস, ইনস্ট্রুমেন্ট, অ্যাপ্লায়েন্স, কন্ট্রাইভান্স ডিভাইস ইত্যাদি অনেক শব্দের জন্ম বাংলায় একটাই শব্দ যন্ত্র। ওদিকে পৃথিবী, সূর্য, রাত্রি রাজা, ঠাকুর দেবতাদের নামাবলি বাংলায় প্রচুর। একথা বলা চলে যেখানে যে জিনিসের প্রাচুর্য, কিংবা যে জিনিস উৎপন্ন হয় বা যার চর্চা বেশি হয়, সে বিষয়ের শব্দও ভাষায় তৈরী হয়ে যায় অনেক। এ থেকে কি সমাজচিত্র পাওয়া যায়? যদি যায় তবে আমাদের ভাষার প্রায়োগ্য শব্দাবলির বিশ্লেষণ কিয়ৎপরিমাণে অবশ্যিবাচক হয়ে উঠতে পারে। খ্যাতির ঝুলিতে যত শব্দ আছে তার চেয়ে বেশি আছে অখ্যাতি প্রসঙ্গে। তত্রতা, অকপটতা, লোভহীনতা, গুণ, বন্ধুত্ব, সৌভাগ্য, নাছোড়বান্দার থেকে অভদ্রতা, কাপটা, লোভ, মোহ, বিবাদ, বিরোধ, দুর্ভাগ্য, ভীরুতার পাল্লা ভারি। দুঃখ আনন্দ প্রায় সমান সমান। তবে কান্নার চেয়ে হাসির ঝুলি মাপে বড়ো। নারীদেহ বর্ণনার শব্দের কোনো ঘাটতি নেই। উপক্ষেণীয় নয় পতিতা শব্দের প্রতিশব্দের সংখ্যাধিক্য। এর থেকে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে হয়তো আসা যাবে না চট্‌জলদি। তবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী গবেষকরা ভেবে দেখতে পারেন বিষয়টি।

এই বক্তৃতার জন্য আমাকে আহ্বান জানিয়ে যে সম্মান আপনারা আমাকে দিয়েছেন তার মূলে আছে আপনাদেরই বদান্যতা—তা আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্বীকার করছি। এই নিবন্ধের অনেক অংশই বারোমাস ও আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাগুও এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি। সবাইকে জানাই প্রীতি ও শ্রদ্ধা। নমস্কার।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা

পরিষদ ভবন, ২. ৮. ৯২/বিকাল ৪ ঘটিকা

আলোচ্য বিষয়সমূহ :—

১. ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।

২. ১৯৯০-৯১ সালের বার্ষিক বিবরণী অনুমোদন।

৩. ১৯৯০-৯১ সালের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।

১৩৯৭ বঙ্গাব্দের "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য "তিনকড়ি দত্ত" স্মারক পদক দান।

৫. সদস্যগণ কর্তৃক নিম্নমাফিকভাবে উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনা।

৬. বিবিধ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ :—সর্বশ্রী অরুণ রায়, প্রবীর দে, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, গৌতম গোস্বামী, কালীপ্রসাদ, কৃষ্ণপদ মজুমদার, গৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সুচিত্রা গাঙ্গুলী, প্রণবানন্দ জানা, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, সিনাকীনাথ মুখার্জী, অজয় কুমার ঘোষ, রামকৃষ্ণ সাহা, শশাঙ্ক বাগচী, কমলেশ ভট্টাচার্য, মদনমোহন মল্লিক, দেবব্রত ভট্টাচার্য, অরুণাভ ভৌমিক, কেশবলাল চক্রবর্তী, অসিতাভ দাস, নারায়ণ চক্রবর্তী, রমেন্দ্র রায়, সাত্যকী চৌধুরী, রীতা চন্দ্র, মধু চন্দ্র, মৃণালকান্তি মণ্ডল, সুধীর সরকার, স্বপন কুমার মান্না, গীতা চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত সান্যাল, অনিমেষ চন্দ্র বসু, নীলাদ্রী পাকড়াশি, এম. এন. নাগরাজ, পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত, বরুণী বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক, কৃত্তিবাস স্মৃতিভবন তথা সংগ্রহশালা, নদীয়া, মদনমোহন মণ্ডল, গুরুদেব ব্যানার্জী, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, নিত্যাই চন্দ্র ঘটক, বনবিতা পাল, অশ্রুশ্রী রায়, সত্যব্রত সেন, বাণী চক্রবর্তী, দেবব্রত হোরমার, শ্যামলকুমার পাল, বিশ্বজিৎ ঘাটাকুরে, পলি সেন, কল্যাণী প্রামাণিক, অরুণা ঘোষ, অর্চনা শ্রীমানী, অরশ্রী সেন, গোপিকা প্রসাদ ঘোষ, রথীন দাস, পুলক কর, আশিস নিয়োগী, মীনা ভট্টাচার্য, কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বেবী রায়, অমলেন্দু বেরা, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দদুলাল বিশ্বাস, বিমলনারায়ণ শূর। সভায় মোট ৬৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

শোকপ্রস্তাব

সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

(১) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন মুখ্য গ্রন্থাগারিক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও পরিষদের আজীবন সদস্য অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী;

(২) সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক ও পরিষদের প্রাক্তন শিক্ষক অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য;

(৩) জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক বিজয় সেনগুপ্ত;

(৪) রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারের প্রাক্তন সম্পাদক বীরেন্দ্র কুমার বসু;

(৫) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রভবনের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক সনৎ বাগচী;

(৬) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক প্রীতি সুধানাগ;

(৭) যমযম মতিঝিল কলেজের গ্রন্থাগারিক সুধীর ঘোষ।

(৮) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক বিমল কুমার দত্ত ;

(৯) উত্তর ২৪-পরগণার অলপোয়ের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক কালীজীবন সরকার ;

(১০) ন্যাশনাল এ্যাটলাসের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক নারায়ণ সাহা ;

(১১) পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র দেবাশিষ রায় ;

(১২) ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা এস বাসবপুন্নাইয়া ;

(১৩) পঃ বঙ্গের বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা মনোরঞ্জন রায় ;

(১৪) পঃ বঙ্গের বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা কমল সরকার ;

(১৫) বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক ও শিশু সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায় ;

(১৬) বিশিষ্ট চিত্রাভিনেত্রী কানন দেবী।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের যেসব মুসলমানের জীবনাবসান ঘটেছে তাঁদেরকে এই সভা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছে।

১। বিগত ৩০।৬।৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী যুগ্ম কর্মসচিব শ্রীকৃষ্ণপদ মজুমদার সভায় পাঠ করেন। কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

২। কর্মসচিব শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা পরিষদের ১৯৯০-৯১ সালের কার্যবিবরণী সভায় অনুমোদনের পেশ করেন।

আলোচনা

(ক) শ্রীকমলেশ ভট্টাচার্য্য :—বিগত বছর একটিও ফাউন্সিল সভা না হওয়া পরিষদের সংবিধান অনুযায়ী ঠিক হয়নি। পরিষদের সদস্যসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, প্রাথমিক সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন। পরিষদের সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতির সভা অনেকদিন হচ্ছে না, সভা ডেকে সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

(খ) শ্রীঅমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন যে, বহু সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারে দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন হয় না। কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী একটি বড় গ্রন্থাগার এই গ্রন্থাগারে ১৯৭৮ সালের পর নির্বাচন হয়নি। সব গ্রন্থাগারে যাতে নির্বাচন হয় সেটা দেখা প্রয়োজন।

(গ) শ্রীবণীকুমার বাগচী বলেন যে পরিষদের প্রাক্তন সহ সভাপতি প্রয়াত রামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরিবার সম্পর্কে পরিষদের পক্ষ থেকে খোঁজ খবর নেওয়া প্রয়োজন।

(ঘ) সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী রাজ্যের বর্তমানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। প্রথমে তিনি আত্মসমালোচনা করে বলেন যে, প্রয়োজন অনুযায়ী সক্রিয়তা পরিষদ দেখাতে পারছে না। এই ব্যর্থতার দায় আমাদের সকলের। তিনি বলেন যে, রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের সভা নিয়মিত ভাবে হচ্ছে। এস. এস. এ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লাইব্রেরী ডাইরেক্টরেট ও এস. এস. এ-র মধ্যে এবং অর্থদপ্তর ও গ্রন্থাগার দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা যাচ্ছে। সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে নিয়োগের জন্য 'নিয়োগবিধি' তৈরী হয়েছে কিন্তু আর্থিক নিষেধাজ্ঞা থাকার জন্য নিয়োগ হচ্ছে না। সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনের কাজ যাতে সুষ্ঠভাবে হয়, তার জন্য পুস্তক নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখনও সরকারী নির্দেশনামা প্রকাশিত হয়নি। বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য একক্যালীন অনুদান দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি শ্বেতপত্র মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেজন্য স্থির হয়েছে আগামী ১১-১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ ডঃ রঙ্গনাথন জন্ম শতবর্ষে উপলক্ষে দুর্গাপুরে ক্রীড়াঙ্গনে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মশালা পঃ বঃ সরকারের উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, আগামী ১২।৮।৩২ তারিখে মৌলালীস্থ রাজা রাজেন্দ্রলাল স্মৃতিমন্দিরে "অধ্যাপক রঙ্গনাথন স্মারক বক্তৃতা" অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১৩।৮।৩২ তারিখে "বোস ইনষ্টিটিউটে" ডঃ রঙ্গনাথন সম্পর্কে সারাদিন ব্যাপী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। "রঙ্গনাথন ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার" বিষয়ে আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করার চেষ্টা পরিষদের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। এ ছাড়া পরিষদ থেকে অধ্যাপক রঙ্গনাথনের ছবি ও বক্তৃতার গ্যালেট প্রকাশ করার চেষ্টা হচ্ছে।

আলোচনার জবাবী ভাষণে কর্মসচিব শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা বলেন যে, পরিষদের সকল সদস্যকে ডাকযোগে গত ১৩।৭।৩২ তারিখে বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রায় কোন সদস্যই সেগুলি পাননি। সেজন্য উপস্থিতির হার অত্যন্ত কম।

তিনি বলেন যে, মাত্র দুই জন সদস্য কার্যবিবরণীর উপর আলোচনা করেছেন—তার অর্থ কি এই যে মাননীয় সদস্যগণ গঠনমূলক সমালোচনা করতে অনীহ হয়ে পড়েছেন? পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়া বা কমে যাওয়া সম্পর্কে বলেন যে, "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন" অনুষ্ঠিত না হওয়াই এর অন্যতম কারণ, বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সম্মেলন করা যাচ্ছে না।

পরিষদের সাংগঠনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন যে, পরিষদের কাজে ছাত্রদের অংশগ্রহণ কমে যাচ্ছে। কর্মীর অভাব ও আর্থিক অবস্থা এখন সংকটের পর্যায়ে পৌঁছে। শনিবার গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষে পরিষদের দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। অথচ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কর্মসূচী এবং গ্রন্থ মেলাগুলিতে তাঁদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত ভাল। পরিশেষে তিনি বলেন যে, পরিষদের কর্মধারা সন্তোষজনক চলছে না, সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা এবং পরামর্শ প্রয়োজন।

কর্মসচিবের জবাবী ভাষণের পর সভাপতি প্রতিবেদনটি গ্রহণ করা সম্পর্কে সভার মতামত জানতে চান। সভায় প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় ১৯৯০-৯১ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করেন। তিনি বলেন এটা লক্ষ্যণীয় যে, আলোচ্য বছরে ব্যয়ের পরিমাণ আয়ের চেয়ে অনেক বেশী। ১৯৯১-৯২ সালে অবস্থা আরও কঠিন হবে।

সভায় আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৪। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায় জানান যে, বিচারক মণ্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী কার্যনির্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ১৩৯৭ সালে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅরুণ ঘোষ মহাশয়ের লেখা "সমাজবিজ্ঞান তথ্য ব্যবস্থাপনার কয়েকটি দিক" (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭) শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

শ্রীঅরুণ ঘোষের অনুপস্থিতিতে 'সম্পাদক' প্রস্তাব করেন যে বার্ষিক সাধারণ উৎসবে "তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক" শ্রীঘোষের হাতে অর্পণ করা হোক। সভায় উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৫। কর্মসচিব, শ্রীকমলেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রেরিত সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রস্তাবটি সভায় পাঠ করেন এবং বলেন যে, কার্যনির্বাহক সমিতি প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন।

সভায় প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাপতির ভাষণে শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, সরকার পোষিত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মনে হচ্ছে গ্রন্থাগার আন্দোলনে ভাঁটা শুরু হয়েছে—বুদ্ধিজীবী বাইরের মানুষ আর এই আন্দোলনে তেমনভাবে অংশগ্রহণ করছেন না। এছাড়া পরিষদের জনসংযোগ অনেক কমে গেছে; স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা এর অন্যতম প্রধান কারণ বলে তিনি মনে করেন।

সভাপতি ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন (১৮৯২-১৯৭২)

একটি জ্যোতিষ্ক ও তাঁর কয়েকটি অবদান

শ্যামল কুমার পাল

গ্রন্থাগারিক কল্যাণনগর বিদ্যাপীঠ, পানশিলা, উঃ ২৪ পরগণা

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, বিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তেমন একটি প্রতিভা রঙ্গনাথন, যাঁর প্রতিভার স্পর্শে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র যথা বর্গীকরণ, ক্যাটালগ তত্ত্ব ও প্রয়োগ, গ্রন্থাগার সংগঠন, গ্রন্থাগার পরিচালন, গ্রন্থবিদ্যা, ডকুমেন্টেশন, ইনফরমেশন সায়েন্স প্রভৃতি বিকশিত হয়েছে। পিতা রামামৃত আয়ার এবং মাতা সীতালক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠপুত্র রূপে এই প্রতিভাবান পুরুষ, ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন, জন্মগ্রহণ করেন মাদ্রাজ শহরের তাঞ্জাভুর জেলার শিয়ালি গ্রামে ১৮৯২ সালের ১৯ আগস্ট।

ঐতিহ্যগত রীতি অনুসারে তিনি লেখাপড়া আরম্ভ করেছিলেন ১৮৯৭ সালের অক্টোবর মাসে বিজয়াদশমীর দিন। ১৯০৮ সালে এস. এম. হিন্দু হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৯ সালে মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি বি. এ. পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বর্তমান শতকের ২য় দশক থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত তাঁর অদম্য কর্মশক্তি ও অজস্র রচনা ভারতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে। কেবল ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে এই সময়কাল যথার্থ ভাবেই আধুনিককাল। সমগ্র বিশ্বে এই পাঁচ দশক ধরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান যে পরিবর্তন হয়েছে, সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন—এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি পাঁচটি সূত্র (Five Laws) নির্দেশ করেছিলেন, যাহা প্রকাশ হয়েছিল ১৯২৮ সালে।

একটি নতুন ক্লাসিফিকেশন স্কীম উদ্ভাবন করার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন ১৯২৪ সালে। ১৯৩০ সালে এই কোলোন ক্লাসিফিকেশন প্রকাশিত হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর যে কোন বিষয় (subject) কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধারণা (bits of ideas) তে বিশ্লেষণ করা যায়। পরবর্তীকালে এই ধারণাগুলিকে facets বলা হয়।

ক্যাটালগিং-এ রঙ্গনাথনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান classified catalogue code সৃষ্টি, যাহা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে।

সূচিকরণের জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শৃঙ্খল সূচির প্রবর্তন (১৯৩৮ সালে)। সূচিভুক্ত এই সূচি প্রায় স্বয়ংক্রিয় ভাবেই বিষয়সূচী তৈরী করতে সাহায্য করে। কোন বিষয়কে বিশ্লেষণ করলে উচ্চস্তরের ধারণা থেকে স্তরে স্তরে নিম্ন স্তর পর্যন্ত যে বিভাজন রেখা যায়, সেই বিভাজনকে ভিত্তি করে এই বিষয়সূচি তৈরী করা হয়।

গ্রন্থ নির্বাচনে তাঁর অবদান প্রধানতঃ তার Five Laws-র উপর নির্ভরশীল। গ্রন্থ নির্বাচনে তিনি পাঠক (Readers), দলিলপত্র (Documents) এবং অর্থ—এই তিনটিকে চিহ্নিত করেছেন।

গ্রন্থাগার হল সংবাদসিন্ধু। তথ্যের জগতের তোরণদ্বার। কিন্তু এই সংবাদসিন্ধুতে অবধি অবতরণ বা তথ্যজগতের তোরণদ্বার সকলের কাছে উন্মুক্ত নয়। জিজ্ঞাসু পাঠকের

উন্নয় পাবার পথে সুচারুরূপে ও লক্ষ্যভাবে সঙ্গে যে ব্যক্তিগত সেবা তৎপরতা তাই হল রেফারেন্স সার্ভিস। তিনি কোরেছিলেন পাঠক, গ্রন্থাগারিক এবং ক্যাটালগ এই তিনের মধ্যে সমন্বয় সাধনই হল রেফারেন্স সার্ভিস।

উপরে বর্ণিত অবস্থানগুলি গ্রন্থাগারের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ। এছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উন্নতি সাধনের জন্য মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ (Madras Library Association) গঠন করেছিলেন এবং তিনি ১৯২৮ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত সম্পাদকরূপে কাজ করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ইস্তফা দিয়া তিনি ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এর আমন্ত্রণে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করেন। ১৯৪৮ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি Doctors of Letters ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা কোর্স এবং মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স প্রচলন করেন। সম্ভবত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এই মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সটি ছিল বিশ্বের গণতন্ত্র রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম। গ্রন্থাগার এবং তথ্যবিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র (F I D)-এ তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন এই বৎসরই। তাছাড়া তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উন্নতির জন্য Madras Public Library Act 43 বিধিবদ্ধ করেন। ১৯৫৩-৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ফুরিখে ছিলেন। ১৯৫৭ সালে বাঙ্গালোরে আসেন। অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের আগ্রহে ড: রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে ১৯৬১ সালে DRTC (Documentation Research Training Centre) স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যধারা হচ্ছে গ্রন্থাগার এবং তথ্যবিজ্ঞানে গবেষণা ও শিক্ষার প্রসার করা।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি নিজেকে গভীর চিন্তা ও পড়াশুনায় নিযুক্ত করেছিলেন। জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর ধরে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল—তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বলতেন, "My body is now-cooperative and decaying but my mind and spirt are young and refreshing"। ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি অনলস পরিশ্রম করেছিলেন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগার বৃত্তির উন্নতির জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা করেছিলেন।

References

1. Library Science Today Vol-I. P. N. Kaula.

2. Encyclopedia of Lib, & Information Science. v-25

3. রেফারেন্স সার্ভিস ও বাংলা আকর গ্রন্থ—ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী

4. গ্রন্থাগার সংগঠন—শীযুক্ত কান্তি মহাপাত্র।

7.52
.038

॥ শোক সংবাদ ॥

মানবরত্ন গৌরীনাথ শাস্ত্রী

পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রীর জীবনাবসানে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, এক উন্নতশির, ঋজু মেরুদণ্ডের তেজোদীপ্ত ব্যক্তি মানুষকে হারাল। এই ক্ষতি অপূরণীয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইণ্টারমিডিয়েট, বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি আর এস ও ডি লিট হন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হিসেবে জীবন শুরু করলেও পরবর্তী পর্যায়ে তিনি হয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী পণ্ডিত গৌরীনাথ তাঁর আমলে জার্মান ও জাপানীসহ কয়েকজন বিদেশী পণ্ডিতকে গবেষণার কাজে সুযোগ করে দিয়ে এবং তাঁদেরও বহু আমন্ত্রিত পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থ তাঁর সম্পাদিত সংস্কৃত কলেজ গবেষণার গ্রন্থমালায় প্রকাশ করে সংস্কৃত কলেজকে বিশ্বের এক অগ্রগণ্য ভারততত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মানবরত্ন ও জ্ঞানকর্মযোগী উপাধিতে ভূষিত পণ্ডিত শাস্ত্রীকে এশিয়াটিক সোসাইটী ও অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স সভাপতির আসনে এবং বারাণসী সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য পদে বরণ করে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান জানান।

গৌরীনাথের নিরলস সাধনা ও গবেষণার ফসল তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থরাজী। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ "ফিলজফি অব্ ওয়ার্ড অ্যাণ্ড মিনিং" (১৯৫৯) ও শেষ গ্রন্থ "দি ফিলজফি অব্ ভর্তৃহরি" (১৯৯২) শব্দ দর্শন বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ বিশ্বজোড়া প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ও ভারতীয় দর্শনের এই বিশেষ দিকটি তুলে ধরেছে।

আশি বছর বয়সের তরুণ গৌরীনাথ পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গেও নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতীয় ঐতিহ্যের শিক্ষার অর্থ সহনশীলতা ও ভিন্ন ধর্ম বা মতাদর্শের বিশ্বাসে আঘাত না দেওয়া। তাঁর অনুপস্থিতিতে এই বিশ্বাসকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়াই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান।

প্রতিবেদক : অসিতাভ দাস

P8440

ENGLISH ABSTRACT

Ratna Benerjee (Das)

GRANTHAGAR V. 41, No. 10, Jan-Feb 1992

Editorial : A capricious circular (pp. 221—212)

In 1981 by the order of the 2nd pay Commission, the scale of the school librarians was raised. But, in 1988, according to order of the Deputy Secretary of the Education Department, librarians were deprived of the facilities that were enjoyed by the teachers. The school librarians had to go to court. The court declared the order as illegal and ordered the state to pay the dues to the librarians. The 3rd pay commission (March 1990) recommended pay for the school librarirns according to their qualifications. But, again, an order was issued in Nov, 1991 by the Secretary of the Education Department not to give the higher scales to the school librarians even if they have the requiered qualifications

Audio visual materials in the context of Library and Information Science—by Biswajit Dey (pp. 213—220)

The author emphasises the importance of audio visual materials as media of education and recreation in the present society.

A librarian looks back—by Asitabha Das (pp. 221—225)

It traces the development of the school libraries and shows the attitude of the Board of Education as well as the Government toward school libraries and librarians.

Annual Subscription : Rs. 48·00
Single issue Rs. 4·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. Nr. R. N. 2674-47

GRANTHAGAR

Volume 42 : No. 7 Oct-Nov, 1992

	PAGE
Literacy Movementt (Editorial)	129
20th December	130
Dr. Anil Ch. Pal	
Library System and Reading Habit	131
Ashoke Mukherjee	
Bengali Thesaurus Compilation	136
56th Anual General Meeting of	
Bengal Library Association	146
Shyamal Kr. Pal	
Dr. S. R. Ranganathan (1892-1972)	149
Obituary	151
English Abstracts	152

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 44-6866 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor : Pinakinath Mukhopadhyay